ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৫১ সংখ্যা ।। ৩০ শ্রাবণ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৬ আগষ্ট, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

শ্রীঅরবিন্দের ১৩৯তম জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত।

তখন শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাও বেরোচ্ছে। স্ত্রীকে চিঠি লিখছেন ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে —মৃণালিনীদেবী তখন দেওঘরে।

"জানি দেওঘরে একলা থাকিতে তোমার কষ্ট হয়, তবে মনকে দৃঢ় করিলে ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিবে না। যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য; মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙালির মতো পরিবার বা স্বজনের সুখ, জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্মই তোমার ধর্ম, আমার নির্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই।..."

শ্রী অরবিন্দের শিক্ষক জীবন...পৃ. ৬

বাংলাদেশের দখলে ভারতের জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কয়েক বছর আগে অসমে ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী ডঃ ভূমিধর বর্মন রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, অসমের প্রায় পাঁচশ একর জমি দখল করে নিয়েছে বাংলাদেশ। অসমের ধুবড়ি এবং করিমগঞ্জের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে ওই জেলা দু'টির ডেপুটি কমিশনার যে সাম্প্রতিকতম রিপোর্টটি পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে শুধু ৫০০ একরই নয়, তার থেকে অনেক বেশি জমির দখল এই মুহূর্তে বাংলাদেশীদের হাতে। সেই জমির পরিমাণ ৬৮৪.৯৩ একর, এমনই বলা হয়েছে ওই রিপোর্টে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল এজন্য সরাসরি দায়ী করছেন অসমের তরুণ গগৈ সরকারকে। স্রেফ ভোটের তাগিদে অবাধে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশে মদত দেওয়ার ফলেই যে বাংলাদেশী আগ্রাসনের ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে একমত নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরাও।

তবে তরুণ গগৈ সরকারের ঘুম এখনও ভাঙেনি। গোয়েন্দাদের রিপোর্টে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কাছে এ বিষয়ে সবিস্তার রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। কেন্দ্রের চিঠি পেয়ে অসম সরকারের ভূমি-রাজস্ব দপ্তর শেষ পর্যন্ত ধুবড়ি এবং করিমগঞ্জের ডেপুটি কমিশনারদের কাছে এব্যাপারে রিপোর্ট তলব করে। রিপোর্ট দেখে চক্ষু-চড়কগাছ হবার যোগাড়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, বড়োইবাড়ি এলাকার ১৮৯.০৬ একর জমি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের দখলে। রিপোর্টে অসমের বড়োইবাড়ি এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, ধুবড়ি জেলার মানকাচর রেভিনিউ সার্কেলের অন্তর্গত থাকুরানবাড়ি গ্রামের একটি অংশ এটি। এছাড়াও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে পাল্লাটাল চা বাগানের ৩৩০.৫৮ একর জমি (২২৫ নং সীমারেখাবর্তী অংশ), যার মধ্যে পাথারিয়া জঙ্গলের বি ব্লক এবং প্রমোদ নগর চা বাগানও রয়েছে এবং করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার রেভিনিউ সার্কেলের ২২৬ নং বোমলা স্ট্রীপের ১৬৫.২৯ একর জমি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের দখলে। সেই রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট তথ্য আরও বিস্তারিতভাবে বলা রয়েছে। বড়োইবাড়ি এলাকায় প্রায় দু'শো ঘর লোকের বাস। জনসংখ্যা চার হাজার। পাল্লাটাল চা বাগানে বাংলাদেশের খাসী সম্প্রদায়ের জনগণের বাস। পাথারিয়া বনের বি ব্লক এবং প্রমোদ নগর চা বাগানকে ঘিরে রয়েছে জঙ্গল। সব মিলিয়ে হিসেবটা এরকমই দাঁড়াচ্ছে— ভারতবর্ষের হকের অংশ অসমের ৬৮৪.৯৩ একর জমির ওপর সম্পূর্ণ অধিকার কায়েম করতে সমর্থ হয়েছে বাংলাদেশ।

এমনিতে, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের কারণে গত শতাব্দীর শেষ দিক (এরপর ৪ পাতায়)

ভারত-বাংলাদেশের উন্মুক্ত সীমান্ত।

অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার নিয়ে অসন্তুষ্ট গৌহাটি হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অবৈধ বাংলাদেশীদের বিতাড়িত করার পুরো প্রক্রিয়াই একটা প্রহসন। সম্প্রতি অসম সরকারের বিরুদ্ধে এমনই মন্তব্য করল গৌহাটি হাইকোর্ট। অসম থেকে বিতাড়িত বাংলাদেশীদের অবৈধভাবে পুনরায় অনুপ্রবেশের সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে গত ৪ আগস্ট হাইকোর্ট জানায় এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে বিদেশী চিহ্নিতকরণের বিচারালয়গুলি স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো ঠিকঠাকভাবে কার্যকর হচ্ছে না।

সম্প্রতি বিতাড়িত বাংলাদেশী নাগরিক মহঃ মোতিয়ুর রহমানের আবেদনের ভিত্তিতে শুনানির পর বিচারপতি বি কে শর্মা জানান, বিদেশী চিহ্নিতকরণের বিচারালয় সমেত অনুপ্রবেশকারী বিতাড়নের পুরো প্রক্রিয়াটাই এখন একটা হাস্যকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এতে আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী নাগরিকদের সনাক্তকরণ ও বিতাড়িত করার স্বার্থে স্থাপিত বিদেশী চিহ্নিতকরণের বিচারালয়গুলোর জন্য যে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাও অর্থহীন বলে উল্লেখ করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশর্মা।

আবেদনকারী তাঁর আবেদনে জানায় গত ২০ নভেম্বর ২০০৮ সালে পুলিশ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ঘন জঙ্গলে তাকে ছেড়ে দেয়। ওই বছর গত ১৪ নভেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলেও জানায় রহমান। পুরো ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে, অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বিতাড়িত করার পুরো প্রক্রিয়ারই কঠোর সমালোচনা করে হাইকোর্ট।

এই মামলায় গত ১৯ মে ২০১০ সালে হাইকোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যে উত্তর পেশ করেছে সেটারও তীব্র সমালোচনা করে গৌহাটি

(এরপর ৪ পাতায়)

রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট

হিন্দু সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। হিন্দু সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তুলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার যেভাবে হিন্দুজনমানসের উপর আঘাত হানছিল, এবার সেখানেই চপেটাঘাত করেছে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, খোদ রাষ্ট্রসঙ্ঘও। হায়দরাবাদে মক্কা মসজিদে ২০০৭-এর মে মাসে বিস্ফোরণ ঘটানোর পিছনে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা রয়েছে বলে ইউপিএ সরকার অভিযোগ করে। এখন মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণের ঘটনার জন্য হরকত-উল-জিহাদ-অল-ইসলাম (হুজি)-কে দায়ী করে আমেরিকা ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণের পেছনে হুজি ও লস্কর-এ-তৈবাকে যৌথভাবে দায়ী করেছে। ভারতে যেসব সন্ত্রাসবাদী ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে তাতে এই দুই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী জড়িত বলে

(এরপর ৪ পাতায়)

বিজয়ওয়াড়ায় দিশাহীন সি পি এম

।। গূঢ়পুরুষ ।। একেই বলে ভূতের মুখে রাম নাম। সি পি এমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট দলের বিজয়ওয়াড়া সম্মেলনে বলেছেন সাচ্চা কম্যুনিস্টের কাছে নির্বাচনে জয়-পরাজয় মূল্যহীন। মার্কসবাদী আদর্শটাই বড়। তাই পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলে এবার বিধানসভার নির্বাচনে কম্যুনিস্টদের পরাজয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং ক্ষমতায় না থাকলে দলের পুরো শক্তি সাংগঠনিক কাজে দেওয়া যায়। ভাল জনসম্পর্ক গড়ে তোলাটাও সহজ হয়। এই কথাই এর আগে কারাট মার্কসবাদী বৃটিশ ইতিহাসবিদ এরিক হবস্‌বমকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। পরে বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় কারাট বলেছিলেন, এমন কথা তিনি বলেননি। অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঝামেলায় পড়লে সাচ্চা কম্যুনিস্টরা এমনই বলেন। আর মিথ্যা ধরা পড়লে বলেন, 'মূল্যায়নে আমাদের ভুল হয়েছিল'।

কারাটের এমন বোধদয় হঠাৎ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের যে ভরাডুবি হতে চলেছে দলীয় রিপোর্টেই তা স্পষ্ট। জানা গেছে, দলের পক্ষ থেকে জেলাওয়ারি যে সমীক্ষা করা হয় তাতে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বাম প্রার্থীরা বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে ৭৫-৮৫টি আসন পাবে। বিজেপি প্রার্থীরা দার্জিলিং পাহাড়ের তিনটি বিধানসভা আসনে জনমুক্তি মোর্চার সমর্থন পেলে নিশ্চিতভাবেই জিতবে। বাদবাকি আসনগুলি দখল করবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী জোট প্রার্থীরা। এই সমীক্ষা রিপোর্টটি জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কারাটের হাতে তুলে দেন বিমান বসু। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই কারাট বিজয়ওয়াড়ায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বামবিরোধী জোটে কংগ্রেস গুরুত্বহীন 'জুনিয়ার পার্টনার'। কারণ, সিপিএমের সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুর এবং দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বাইরে কংগ্রেস প্রার্থীরা জিতবেন না। অন্যান্য জেলায় কংগ্রেস এখন সাইনবোর্ড সর্বস্ব পার্টি।

বিজয়ওয়াড়া সম্মেলনে কারাটের পেশ করা খসড়া রাজনৈতিক দলিলের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে গোল বেঁধেছে বিস্তর। এতকাল

(এরপর ৪ পাতায়)

জরুরী অবস্থার তথ্য লোপাট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কোথায় গেল '৭৫-'৭৭-এর সেই জরুরী অবস্থার কালোদিনের সব তথ্য? এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলছে তথ্য রয়েছে গৃহ-মন্ত্রকের কাছে। গৃহ-মন্ত্রকের অঙ্গুলি জাতীয় অভিলেখ্যাগার (আর্কাইভ)-এর দিকে। জাতীয় অভিলেখ্যাগার আবার এ নিয়ে ঠেকিয়ে দিচ্ছেন মুখ্য তথ্য আধিকারিক (চীফ ইনফরমেশান কমিশনার)-কে। আর এই তথ্যের ব্যাপারে মুখে কুলুপ এঁটেছেন মুখ্য তথ্য আধিকারিকও।

সঙ্গত কারণেই তাই প্রশ্ন উঠছে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে তৎকালীন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী

INDIAN HERALD
SPECIAL SUPPLEMENT
EMERGENCY DECLARED
JP, Morarji, Advani, Asoka Mehta & Vajpayee arrested

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারীর মতো গণতন্ত্রের টুঁপি টিপে ধরার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেই কালা-ইতিহাসকে আড়াল করতেই কি এই চেষ্টা? আসেতুহিমাচল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সেদিন প্রবল সাহসের সঙ্গে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল— সেই 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' যুদ্ধের গৌরব গাথাকে মুছে ফেলতেই কি এই আড়াল করার প্রচেষ্টা? ইন্দিরা কংগ্রেস সরকারের বর্তমান উত্তরসূরীরা কি সেই 'কালা দিনগুলি'-কে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে চাইছে?

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৫ ফেব্রুয়ারি। অধুনা চেন্নাই নিবাসী (এরপর ৪ পাতায়)

কোরেল রঙিন বিজ্ঞাপন

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মঞ্চ

বাঙ্গালীমাত্রই "সোনার পাথরবাটি" কথাটি জানেন বা শুনিয়াছেন। এই কথাটি যে কোনও হাস্যকর অবান্তর কথা বা ব্যাপার-স্যাপারকে বুঝাইতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ যাহা সোনা দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে তাহা কখনও পাথরবাটি হইতে পারে না। ইহা একান্তই অবাস্তব। গত ৯ই আগস্ট '১০ পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্তর্গত লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের মাঠে তাহাই হইয়াছে। একটি আপাদমস্তক রাজনৈতিক দল 'তৃণমূল কংগ্রেসে'র একমেবাদ্বিতীয়ম দলনেত্রী তো বটেই, তাহার সঙ্গে ছিল এক গুচ্ছ মোসাহেবের দল এবং রাজ্য ও রাজ্যের বাহিরে গজাইয়া ওঠা দলনেত্রীর সমর্থক কিছু তথাকথিত বুদ্ধি জীবীর দল। এই সকল বুদ্ধি জীবী আবার মাওবাদীদের প্রকাশ্য মসীজীবী। তাহাদের তৃণমূলকে সমর্থনের মূল উদ্দেশ্য হইল কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিভাজন আনিয়া মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্রকে দুর্বল করিয়া দেওয়া। যাহাতে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভে মত্ত সি.পি.এম'-এর স্বাভাবিক বিরোধী তৃণমূলের চাপে যেন কোনওমতেই রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার সার্বিকভাবে মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে না পারে। ইহাই হইল এককালের বাম বুদ্ধি জীবী এবং বর্তমানের অতি-বাম বুদ্ধি জীবীদের আসল উদ্দেশ্য বা কৌশল।

বামপন্থীরা চিরকালই কৌশলবাদী। নীতির বালাই তাহাদের নাই বলিলেই চলে। যখন যেমন, তখন-তেমন—ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। এখন মাওবাদীদের রক্ষাকর্তা তথাকথিত বুদ্ধি জীবীর দল সন্ত্রাসবাদবিরোধী সাজিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের সেই বিখ্যাত গল্পটির কথা মনে পড়িতেছে। এক বৃদ্ধ বাঘ নখদন্তহীন হওয়ায় শিকারে অপারগ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পেট তো মানে না। তাই সে ভেক ধরিয়াছে শান্তি প্রেম ও অহিংসার। সে এক পুষ্করিণীর ধারে হাতে সোনার বালা লইয়া বসিয়া পড়ে। সে পথচারীদের বলে, সে হিংসা ত্যাগ করিয়াছে। যে কেহ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আসিলেই এই সোনার বালাখানি তাহার নিকট হইতে লইতে পারে। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এক ব্যক্তির কী পরিণতি হইয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা।

সন্ত্রাসবাদ-ই যাহাদের নীতি ও আদর্শের একমাত্র ভিত্তি, সেই সমস্ত সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ভেকধারীদের হাতে তৃণমূল নেত্রীর কী পরিণতি হয় তাহা দেখিতে রাজ্যবাসী অপেক্ষায় থাকিবে। আজ এই সকল ভেকধারী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইকে এক কানাগলিতে লইয়া যাইতে চায়। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই কাহাদের বিরুদ্ধে ? তাহাদের লক্ষ্য কী ? এই সকল তথ্য পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাহা না হইলে এই সভার লক্ষ্য হইয়া উঠিবে শুধুই ক্ষমতার মিনার। গেরুয়া উষ্ণীশধারী অগ্নিবেশ তো রাজনৈতিক নেতাদের মতো স্পষ্টই বলিয়াছেন, তাঁহার লক্ষ্য লালগড় হইতে লালকেল্লা গমন এবং সেখানে বিজয় পতাকা ওড়ানো। মমতার মুখেও তো তাহার দলীয় লক্ষ্যের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে এই সভা বা মঞ্চ অরাজনৈতিক হইল কেমন করিয়া ? মাওবাদীরা তো বলে তাহাদের দলের নাম সিপিআই (মাওবাদী) অর্থাৎ তাহারা কমিউনিস্ট। কোন্ কালে কে শুনিয়াছে যে কমিউনিস্টরা এক কংগ্রেস দলের সভায় লোক যোগাড় করিয়া আনিতেছে!

এই গোলক ধাঁধাই আজ পশ্চিমবঙ্গে চলিতেছে। মমতার বর্তমান অন্তরাত্মার কথায় মাওবাদী সন্ত্রাসই দেশের পক্ষে প্রধান বিপদ স্বরূপ। একথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনিয়াছি আমাদের প্রধানমন্ত্রীরও কণ্ঠে। কিন্তু তাহাদেরই প্রসাদে বাড়িয়া ওঠা এক জোট সঙ্গী 'তৃণমূল কংগ্রেস' সেই মাওবাদীদের দেশের পক্ষে বিপদ স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লয় নাই। তাহাদের দাবী মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার করিতে হইবে। তাহা লইলে তাহার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মঞ্চের লড়াই কাহাদের বিরুদ্ধে ? কে প্রশ্ন করিবে ? কেইবা শুনিবে ? কারণ আজ সিপিএম এমনই বিশ্বাস যোগ্যতা হারাইয়াছে যে মানুষ আজ সিপিএম-এর কোনও কথাই বিশ্বাস করে না। মমতা আজ যাহা বলে জনগণ তাহাই বিশ্বাস করে। জনগণের পক্ষে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ হইতে পারে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

পূর্বকালীন লোকদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যের অবশ্য জ্ঞেয় ইহা বোধহয় সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন।...বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরান, ইতিহাস, সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই। ...এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন সাপেক্ষ।

...সংস্কৃত ভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষা কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, ভুরি ভুরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ওই সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্বাধীনোত্তর ভারতে জনগণের নিরাপত্তা কতটা নির্ভরযোগ্য ?

বাণীপদ সাহা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিংসা, রক্তপাত ও সন্ত্রাস দেখে শান্তিকামী ও নিরপেক্ষ নাগরিকদের মনে প্রশ্ন জাগে, দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা কতটা শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। এরা বহিঃশত্রুর মদত পেয়ে শক্তিশালী ও বেপরোয়া হয়ে উঠে আঘাতের পর আঘাত করছে। দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এক গোষ্ঠী সন্ত্রাসের সাহায্যে তথাকথিত শ্রেণীহীন ও শোষণশূন্য সমাজ ও সরকার গঠনে তৎপর। এরা মনে করে যে, বন্দুকের নলের সাহায্যে গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ও তথাকথিত বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এক অভিনব সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নিজেদেরকে এরা মাওবাদী বলে দাবী করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে মাওবাদীরা ইতিমধ্যে ১৬টি রাজ্যে এবং ১২০টি জেলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে তামিলনাড়ুর ধরমপুর পর্যন্ত ৪০০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে, "রেড করিডর" নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অঞ্চল থেকে সরকারের শাসন যেন নিশ্চিহ্ন। পরিবর্তে, এখানে মাওবাদীদের শাসন ও আদেশ বা 'রিট' পরোক্ষে বা প্রকাশ্যে বলবৎ হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, প্রয়াত কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশাল বাড়ী থেকে ১৯৬৭ সালে তথাকথিত এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। গত ত্রিশ বছরে মাওবাদী কাল্ট (cult), বিশেষ করে, দেশের সাতটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকে মাওবাদীদের ক্যাডারের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এরা বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে ভয় দেখিয়ে জোর করে আদায় করে। বলা বাহুল্য, আইন ও শাসনকে কলা দেখিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে মাওবাদীদের শক্তি সঞ্চয় ও আঘাতের শক্তি বৃদ্ধি শুধু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির অপদার্থতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল মাওবাদীদের সন্ত্রাস বন্ধ করতে কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেননি। ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের জুন মাসের মধ্যে পুলিশ কর্মী ও সুরক্ষা বাহিনী মিলিয়ে ১০২৬৮ জনের প্রাণ বলি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দুর্বল সরকার ও অনৈতিক প্রতিযোগিতার ও রাজনৈতি অস্থিরতার সুযোগে আইন ভঙ্গ, সংঘাত ও হানাহানি সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে গভীরভাবে ব্যাহত করেছে। এছাড়া আইন শৃঙ্খলার অবনতি, জঘন্য অপরাধ বৃদ্ধি এবং অপরাধীদের 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাব শান্তিকামী ও আইন মান্যকারী জণগণের হতাশা ও শঙ্কা বাড়িয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও গোপন সংস্থাগুলির তৎপরতা এবং বিশেষ কয়েকটি ধর্মীয় জেহাদী সংগঠনগুলির ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দেশের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ও নিরাপত্তার সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীরের মাটিতে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে একাধিক জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে উঠেছে। প্রশিক্ষণ শেষে জঙ্গিদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে গোপনে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করানো হচ্ছে। স্থানীয় জেহাদীরা বহিরাগত উগ্রবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যে অস্থিরতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভারতের অবিচ্ছেদ্য ভূখণ্ড-কে ভারত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ভিন্ন ধর্মীয় জেহাদী সংগঠনগুলি, যেমন লস্কর-ই-তৈবা, জয়েস-ই-মহম্মদ, সিমি, ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে উৎসাহিত করছে এবং ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে পুনরায় ভাগ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে আলফা, বোরো, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে উগ্রবাদীরা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তগুলি অত্যন্ত সক্রিয়। অতীতে খালিদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার এদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের মাটিতে আলফা ৯৬টি প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন করে ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। অসম রাজ্য লাগোয়া বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে উগ্রবাদীদের গোপন আশ্রয়স্থল (sanctury) তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে শিলিগুড়ির মধ্য দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও নেপালে যাতায়াতের ও অস্ত্র পাচারের গোপন ও অবাঞ্ছিত গমন পথ, অর্থাৎ করিডোর, দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে বিশেষভাবে বিঘ্নিত করছে। সুখের কথা, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিদ্বেষী জঙ্গিদের তৎপরতা বন্ধে সহযোগিতা করছে।

বর্তমানে মাওবাদীদের রক্তাক্ত আক্রমণ, নির্বিচারে হত্যা এবং ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস জণগণকে বিচলিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মাওবাদীদের পরিচালিত সন্ত্রাসে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জনগণকে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান করেছেন। চিন্তার বিষয়, প্রতিদিন মাওবাদীরা গড়ে তিন জন মানুষকে হত্যা করছে। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের এক গোপন নোটে সাতটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সাবধান করা হয়েছে।

> **দেশের ও জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে জনগণের মধ্যে স্বতঃফূর্ত চেতনা জাগানো প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে এ শিক্ষার প্রসার সম্ভব। সে অর্থে ইস্রায়েলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স বাধ্যতামূলক হলে জনগণ দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং প্রয়োজন মতো দেশী ও বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে।**

প্রকাশ পেয়েছে যে, ২০০৯ সালে সারাদেশে নকশাল হামলার ঘটনা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর ইতিমধ্যেই ১১০৩টি ঘটনা ঘটেছে, ৩২৫ জন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৪২ জন পুলিশের চর হিসাবে খুন হয়েছে।

ছত্তিশগড় রাজ্য লাল বিগ্রেডের দৌরাত্ম্যে নাস্তানাবুদ। ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ থেকে আলাদা হয়ে ছত্রিশগড়ের জন্ম হয়। রাজ্যের ১৮টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলা ইতিমধ্যে মাওবাদীদের কবলে। ১৯৮০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসে ২০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী। ২০০৭ সালের জুলাই মাস থেকে ২০১০ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ৪১৮ জন নাগরিক, ৪৩৫ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে এবং ১৯৪৮টি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। বিজাপুর, দান্তেওয়াড়া, বস্তার, নারায়ণপুর এবং কাঙ্কর জেলাগুলিতে মাওবাদীদের তৎপরতা তুঙ্গে। ২০০৪ সালে রাজ্য সরকার মাওবাদীদের আত্মসমর্পণের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, কিন্তু আশানুরূপ ফল এখনও পাওয়া যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রায় অদৃশ্য। গত এক বছরে এই তিনটি জেলায় ১৯৭ জন খুন হয়েছে। যৌথ

(এরপর ১৪ পাতায়)

বিশ্ব উষ্ণায়নের নেপথ্যে খাদ্যের ভূমিকাও

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আপনি কি ভোজন রসিক? রেড মিট কি আপনার খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে পছন্দের স্থান পায়? তাহলে জেনে রাখুন আপনি নিজেকে এবং এই গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের পথে আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছেন। তবে এর সমাধানও কিন্তু আপনার হাতে। না কোনও হোম বা যজ্ঞ নয়, আপনাকে করতে হবে একটা ছোট্ট 'পরিবর্তন'। পরিবর্তনটা আপনার খাদ্য তালিকার। 'রেড মিট' বা পাঁঠার মাংসের জায়গায় প্রতিস্থাপন করতে হবে মাছকে।

সম্প্রতি, ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে'র (আই এ আর আই) দেওয়া তথ্যানুযায়ী, ভারতীয় খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশ তালিকাই বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ। এই ক্ষেত্রে পাঁঠার মাংসের অবদানই সবচেয়ে বেশী। তাই গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে মাছকেই পাঁঠার মাংসের জায়গায় ঠাঁই দিতে হবে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে খেতে হবে কলা। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে পাঁঠার মাংসের অবদান সবচেয়ে বেশী। পাঁঠার মাংস কেবল খাবার সময়ই নয়, বিপদ বাড়তে পারে রান্না করার সময়েও। আই এ আর আইয়ের ভূ-বিজ্ঞানী হিমাংশু পাঠকের মতে, বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণ বায়ু মণ্ডলের স্তরে কার্বন, নাইট্রোজেন মিথেনের মতো গ্যাসের উৎপত্তি। এই ক্ষেত্রে মিথেনের ভূমিকা কার্বন গ্যাসের তুলনায় ২৫ গুণ বেশী বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শ্রী পাঠক বলেন, একদিকে মিথেন গ্যাসের উৎপত্তি যেমন ভাত, মাংস বা মাছের থেকে হয়, তেমনই অপরদিকে নাইট্রোজেন গ্যাসের উৎপত্তি হয় শাকসব্জি ও ফলমূল থেকে। এই ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন মিথেনের থেকেও একধাপ এগিয়ে। সুতরাং পালাবার পথ নেই। রেড মিট-ই খান বা মাছ-মাংস কিংবা ফল-মূল-বিশ্ব উষ্ণায়ন অনিবার্য। তবে এই সবকিছুর তুলনায় বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধের ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি অবদান কলার। আই এ আর আইয়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, বায়ুমণ্ডলের স্তরে কার্বন, নাইট্রোজেন মিথেনের মতো সব গ্যাসের বিস্তার ঘটে অন্য দেশ থেকে এদেশের খাদ্য পরিবহন করার সময়েও। এই ক্ষেত্রে প্রায় ১ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে বিশ্ব উষ্ণায়নের। খাদ্য বহনের সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের যোগাযোগের কথা স্বীকার করেছেন ইউরোপিয়ান গবেষকরাও। তাঁদের মতে, সম্ভাবনার পরিমাণ প্রায় ৮ থেকে ৩০ শতাংশ। আই এ আর আই জানায়, ১৯৯০ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা ভারতের মাটি থেকে বৃহৎ পরিমাণে মিথেন গ্যাস উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করেন।

আই এ আর আইয়ের তথ্যটি ইকোসিস্টেম এন্ড এনভায়রণমেন্ট নামে ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে বিশ্বউষ্ণায়নের ক্ষেত্রে পাঁঠার মাংসের ভূমিকা মাছের থেকে ১২ গুণ বেশি। এই সমস্ত তথ্যই যে অবশ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সাপেক্ষ এ কথা বলছেন হিমাংশুবাবু।

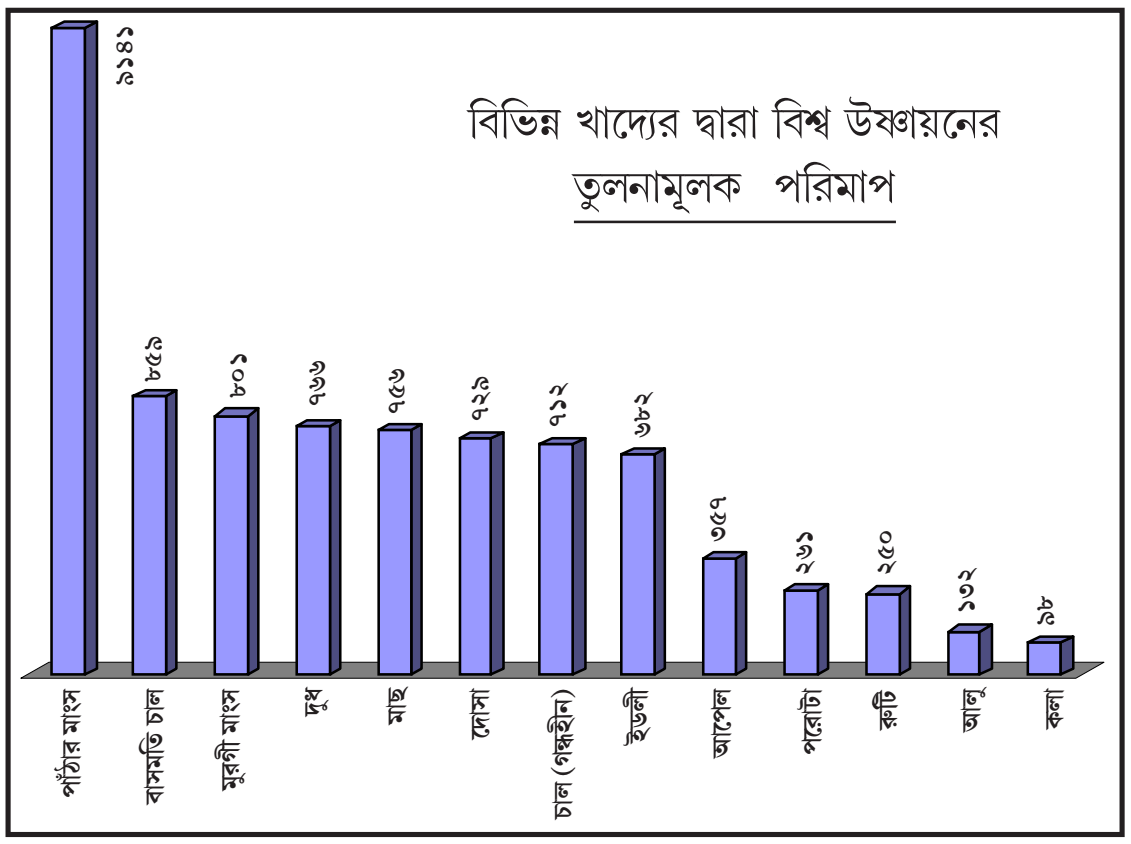

নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা/দৈনিক

পুরুষ	বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিমাপ	মহিলা	বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিমাপ
শাকাহারী (১১৬৫ গ্রাম)	৭২৩	শাকাহারী (৯৯৫ গ্রাম)	৫৮৩
মাংসাশী (খাসির মাংস) (১১১০ গ্রাম)	১০৩১	মাংসাশী (পাঁঠার মাংস) (৯৪০ গ্রাম)	৮৯১

রাষ্ট্রসঙেঘর রিপোর্ট

(১ পাতার পর)

রাষ্ট্রসঙেঘর প্রকাশিত তালিকায় উল্লেখও করা হয়েছে। মক্কা মসজিদের বিস্ফোরণে হুজির ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ওই দুই গোষ্ঠীকে 'সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' হিসাবে আমেরিকা ও রাষ্ট্রসঙঘ চিহ্নিত করেছে এবং একইসঙ্গে 'নিষিদ্ধ 'ও ঘোষণা করেছে। মালেগাঁও ও আজমীর বিস্ফোরণে জড়িত দুষ্কৃতীরা 'অভিনব ভারত'-এর সঙ্গে যুক্ত বলে সরকার সন্দেহ করেছিল। এই অভিযোগ যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা স্পষ্ট।

অসন্তুষ্ট গৌহাটি হাইকোর্ট

(১ পাতার পর)

হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে উদ্দেশ্য করে হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ— দুই সরকারই যেন ২৬ আগস্ট বা তার আগে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে হাইকোর্টের কাছে হলফনামা পেশ করে। অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে যদি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার অসহায় হয়, তবে যেন সেই কথাও তারা তাদের হলফনামায় উল্লেখ করে বলে হাইকোর্টের নির্দেশ।

বাংলাদেশের দখলে

(১ পাতার পর)

থেকেই অসমের ভোটের বাজার আংশিক নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হচ্ছিল অনুপ্রবেশকারীরা। কিন্তু তরুণ গগৈ অসমের ক্ষমতায় আসার পর অনুপ্রবেশকে একরকম রাজনৈতিক স্বীকৃতিই দিয়ে দেন। যার দরুণ অসমের নিয়ন্ত্রণ বহুদিন যাবৎ-ই বাংলাদেশীদের হাতে ছিল। সাম্প্রতিক গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশ সরকার আগামীদিনে অসমের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। এই বছরের ৮ জুলাই অসমের ভূমি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রক কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের কাছে পাঠানো রিপোর্টে জানিয়েছে, বাংলাদেশের দখলে ভারতের অসমের ৬৮৪.৩৯ একর জমি থাকলেও, অসমের দখলে বাংলাদেশের এক ছটাক জমিও নেই!

বিজয়ওয়াড়ায় দিশাহীন সি পি এম

(১ পাতার পর)

সারা দেশেই সিপিএমের রাজনৈতিক শত্রু ছিল বিজেপি এবং কংগ্রেস। দলের কমরেডরা সেভাবেই চিন্তা ভাবনা করতেন। গলাবাজিও করেছেন। কারাটের দলিলে এবার বদলে গেছে মতটা। বলা হয়েছে কেন্দ্রে তাঁদের রাজনৈতিক শত্রু কংগ্রেস এবং বিজেপি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের প্রধান প্রতিপক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি এবং কংগ্রেস নয়। তৃণমূল কংগ্রেস দলের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শত্রু। কারণ, তৃণমূল কর্মীরা মাওবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ২৫০ জন সিপিএম কর্মীকে হত্যা করেছে। বিজেপি-কংগ্রেস খুনের রাজনীতি করে না। তৃণমূল করছে। খুনের বদলায় পাল্টা খুন করে জবাব দিচ্ছে। বিপদটা এখানেই। যে খুনের, হিংসার রাজনীতি মার্কসবাদীদের এতকাল একচেটিয়া অধিকার ছিল সেই একই রাজনীতি অনুসরণ করছে তৃণমূল। তাই দিশাহারা সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের নীতি কী হবে ভেবে পাচ্ছেন না।

সিপিএম এমন ঘোর বিপাকে সাম্প্রতিককালে পড়েনি। কেরলে এখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দলের রাজ্য সম্পাদকের সাপে-নেউলের সম্পর্ক। মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন বলেছেন, জেহাদি মুসলিমদের নাশকতাই দেশের প্রধান বিপদ। কারাট-বিমানরা মনে করেন যে এমন বক্তব্যের ফলে সিপিএম মুসলিম ভোট হারাবে। অর্থাৎ কারাট-বিমানরা দু'মুখো নীতি নিয়ে চলছেন। দলীয় সম্মেলনে বলছেন, নির্বাচনে জেতাটা কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য নয়। আদর্শটাই বড়। সেই একই নেতারা আবার কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে দুষছেন তালিবানি মুসলিমদের দেশ ও সমাজের প্রধান বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য। কারণ, আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে যদি তালিবানি মুসলিমরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সন্দেহ নেই, সিপিএম এখন ক্ষমতা না আদর্শ কাকে রাখবে বুঝে উঠতে পারছেনা।

জরুরি অবস্থার তথ্য লোপাট

(১ পাতার পর)

প্রাক্তন আই এ এস আধিকারিক জি দেবাসায়ম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য তথ্য আধিকারিক সংযুক্তা রায়ের কাছে তথ্য জানার অধিকার বলে কয়েকটি তথ্য জানতে চান। তাঁর জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে ছিল—"২৬ জুন, ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থার কথা ঘোষণার কথা যা বলবৎ ছিল '৭৭-এর মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত, সেই সংক্রান্ত তথ্যাবলী।" আসলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ ও ইন্দিরা সরকারের যোগাযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, শ্রী দেবাসায়ম জরুরী অবস্থা চলাকালীন পাঞ্জাবের চন্ডীগড়ের জেলাশাসক ছিলেন। তিনি এখন বলছেন, "প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, হয় সরকারি আধিকারিকরা সেই তথ্য পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলেছেন অথবা কোনও কারণে তাঁরা তা দেখাতে চাইছেন না। এই প্রেক্ষিতে একটা কথাই মনে হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগগুলো সেই সময় উঠেছিল, তার ন্যূনতম সত্যতা একটা রয়েইছে।"

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কিন্তু একবারও বলছেন না যে জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁদের কাছে নেই। তাঁরা বরং একে অন্যের দিকে ঠেলে দিয়ে দায় এড়াচ্ছেন। যেমন গত ৭ এপ্রিল স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রকের একজন ডিরেক্টর পি কে মিশ্র জানিয়েছেন, জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হচ্ছে গত ২৫ বছর ধরেই। কিন্তু সেই সংক্রান্ত তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বরং জানিয়েছে— জনতথ্য আইন (পাবলিক রেকর্ড রুলস) ১৯৯৭-এর ৫ নং ধারায় এই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যেতে পারে জাতীয় অভিলেখ্যাগারে। অন্যদিকে ১১ মে জাতীয় অভিলেখ্যাগারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রাজেশ ভার্মা দেবাসায়মকে চিঠি মারফত জানান, প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর '৭৫-'৭৭-এর জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁরা পাচ্ছেন না। এরপর কিছুটা হতাশ দেবাসায়ম তাঁর আই এ এস ব্যাচমেট অধুনা চীফ ইনফরমেশান কমিশনার ওজাহাত হাবিবুল্লার কাছে তথ্য জানার অধিকার আইনের ১৮ ধারায় এনিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু এরপর মাস দু'য়েক গড়িয়ে গেলেও সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর পাননি তিনি। অনিবার্যভাবেই তাই প্রশ্নটা উঠছে, জরুরী অবস্থার আগে কিংবা পরে কতটা 'সমধুর' ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকিরুদ্দিন আলি আহমেদ ও ইন্দিরা-সঞ্জয়ের সম্পর্ক?

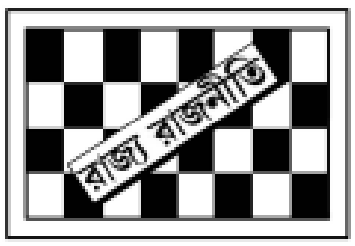

রাজ্য রাজনীতি

আগষ্ট মাস কি ভয়ঙ্কর হতে চলেছে?

নিশাকর সোম

আগস্ট মাসের দুটো দিন আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখ্য। একটি ৯ আগস্ট— ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ঘোষণা মতো যে যাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হলেন। আশ্চর্য, অ্যাতো বড় আন্দোলন-এর ডাক দিয়েও কংগ্রেসী নেতৃবন্দ কোনও গোপন কেন্দ্র করলেন না। মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন—''আমরা স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা করলাম।'' (সূত্রঃ ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম)। যদিও গান্ধী জেল থেকে বেরিয়ে এই আন্দোলনের নিন্দা করেছিলেন। বস্তুত, গান্ধীজী এই আন্দোলনের দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন।

আর একটি দিন হলো ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। ক্ষমতা হস্তান্তর-এর দিন। কমিউনিস্টরা প্রথমে বলেছিল— ''অর্ধেক স্বাধীনতা (রাজনৈতিক) পাওয়া গেছে— অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসেনি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনার জন্য নেহরুর পাশে দাঁড়াতে হবে।'' কিন্তু এর পরেই ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর মাসেই কমিউনিস্টরা ডিগবাজি খেয়ে কংগ্রেস এবং স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল। তার পরেই ১৯৩৮ এর মার্চ মাসে কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ২য় পার্টি কংগ্রেসে বি. টি. রণদিভের নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের ডাক দিয়ে সমগ্র ভারতে তোড়ফোড় কাণ্ড বাধিয়ে দিল কমিউনিস্টরা।

এবার আবার ৯ আগস্ট-এ এক অজানা আশঙ্কা এসে গেছে। মমতা ব্যানার্জি প্রথমে ঘোষণা করেছিলেন, তৃণমূল ৯ আগস্টে লালগড়ে সভা করবে। পরে হঠাৎ পরিবর্তন করে ঘোষণা করলেন, ''অরাজনৈতিক মঞ্চ ''-এর ব্যানারে সভা হবে। এই প্রসঙ্গেই সিপিএম-এর বক্তব্য হলো— ''মাওবাদীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এই ব্যবস্থা।'' মাওবাদীদের গণসংগঠন জনসাধারণ কমিটি এই সভার প্রচারে নেমে পড়েছে। পোস্টার লাগাচ্ছে। এদিকে শান্তিপ্রিয় রাজ্যবাসী ভাবছে— কি হয়? কি হয়? কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা-কে মদত দিচ্ছেন। কেশব রাও-কে সভায় পাঠাচ্ছেন। এই সভার সম্পর্কে তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী তমলুকের জনসভায় বলেছেন, ''লালগড় হবে সিপিএম-এর শেষ গড়।'' আবার রক্তক্ষয়ী লড়াই। রাজায় রাজায় যুদ্ধ —মরণ হয় উলুখাগড়াদের। এখন যখন মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করতে চলেছে, সেই সময় উৎসাহিত হয়ে এমন কাজ কি করা উচিত? একটা তৃতীয় পক্ষের শান্তির দাবি করা উচিত। যুযুধান দু' পক্ষকেই বিরত করা দরকার। হা হতোস্মি— ক্ষমতা মদমত্তে উন্মাদনার রাজনীতি চলছে।

> “রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে এমন একটি ঘটনা হলো— অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া-তে সিপিএম-এর বর্ধিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা— প্লেনাম। এখানে মানিক সরকার হবেন 'মানিক'। বুদ্ধ বাবুরা নিন্দিত হবেন দক্ষিণের এবং অন্যান্য রাজ্যের সদস্যদের কাছে। শেষ পর্যন্ত কৌশলী প্রস্তাব হবে— 'ইন অপারচুন মোমেন্টে— ভুল মূল্যায়নে ইউপিএ-সরকারের থেকে সমর্থন তোলা হয়েছিল।''”

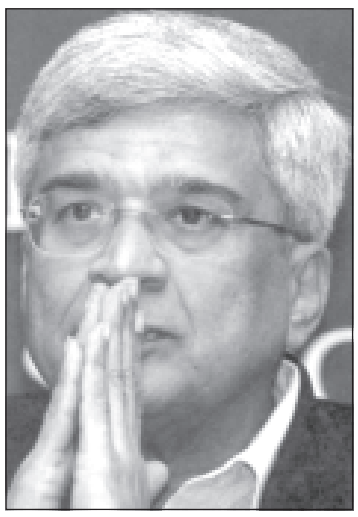

রাজ্যের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে এমন একটি ঘটনা হলো— অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া-তে সিপিএম-এর বর্ধিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভা— প্লেনাম। এখানে মানিক সরকার হবেন 'মানিক'। বুদ্ধ বাবুরা নিন্দিত হবেন দক্ষিণের এবং অন্যান্য রাজ্যের সদস্যদের কাছে। শেষ পর্যন্ত কৌশলী প্রস্তাব হবে— ''ইন অপারচুন মোমেন্টে— ভুল মূল্যায়নে ইউপিএ-সরকারের থেকে সমর্থন তোলা হয়েছিল।''

পশ্চি মবঙ্গের একাধিক প্রতিনিধি প্রকাশ কারাতের পক্ষে থাকবেন। কেরলের প্রতিনিধিদের মধ্যে দু'ভাগ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একটি অংশ প্রকাশ কারাতের পক্ষে থাকবেন।

পরিবহন ধর্মঘটের মূল উদ্যোক্তা হলেন এক তৃণমূলী বিধায়ক। তাঁকে মমতা কৌশলে সামনে থেকে সরে যেতে বলায় তিনি নেপথ্যে কাজ করছেন। তাঁর মালিকানায় নাকি একাধিক বাস ট্যাক্সি আছে? মদন মিত্র কি বলেন?

আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চি মবঙ্গের সিপিএম পরিচালিত সরকার কল্পতরু। কিন্তু আলু কেলেঙ্কারির পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক-সিপিএম দুই পার্টিই এব্যাপারে দায়ী।

বাম নেতাদের মনোভাব হলো— ''লুঠে নে দু'দিন বইতো নয়।''

ক্ষমতালোভী অর্থলোভী দলগুলির করালদ্রংষ্টা দেখা যাবেই। আগামী দিনে এক ভয়াবহ অবস্থা আসছে, সাধু সাবধান।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষকজীবন
বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল

ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর

১৯০২ খৃঃ হতে ১৯০৫ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনের জমি প্রস্তুত করেন শ্রীঅরবিন্দ অন্তরাল থেকে। উদ্দেশ্য, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন সংস্কার নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে সরাসরি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ ফেব্রুয়ারী মাসে বরোদা থেকে কলকাতায় এসে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে একটি প্রগতিশীল গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নতুন পার্টি, যার বিশিষ্ট নেতা তিনি। ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের বাসভবন। এই নবজাত জাতীয়তাবাদী দলের লক্ষ্য হলো স্বরাজ। যা নরমপন্থী দাবীর বিপরীত। হেমচন্দ্র মল্লিক ও সুবোধচন্দ্র মল্লিক শ্রীঅরবিন্দকে আর্থিক ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা দেন। বালগঙ্গাধর তিলক হলেন এই জাতীয়তাবাদী দলের নেতা। মূলনীতি স্বাবলম্বন ও সরকার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশী জিনিসপত্র, আইন আদালত বয়কট করা ও সমান্তরাল ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তোলা।

বিবাহিত জীবন স্বল্প যাপন করলেও শ্রীঅরবিন্দ একধরনের বিপ্লবী সন্ন্যাসবাদ এই আন্দোলনে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রাজনৈতিক আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য যুব কর্মীদলকে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন মা ভবানীর ভক্ত হয়, শক্তিদায়িনী মায়ের আশীর্বাদে তারা যেন মৃত্যুভয় অতিক্রম করতে পারে। ভারতের প্রয়োজন শক্তির। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের আবার নবজন্ম হবে যদি সে তার অন্তরের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, যা হলো শক্তির উৎসমুখ। ভবানী ভারতীর চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সন্ন্যাসীরা কাজ করবে গরীব ও অনগ্রসর মানুষের মধ্যে, তারা কাজ করবে মধ্যবিত্ত ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেও। তারা সবার মধ্যে কাজ করবে ভবানী মন্দিরের আদর্শে নতুন ভারত গড়ে তোলবার জন্য। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ভবানী মন্দির পুস্তিকাটি প্রচারিত হয়। শ্রী অরবিন্দ একটি কমিটি ও ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন ভবানী মন্দির গড়ে তুলবার জন্য, হেমচন্দ্র মল্লিক ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেই কমিটির সদস্য হন। কিন্তু নানা কারণে ভবানী মন্দির পরিকল্পনা কার্যকর হয়নি। তা তোলা আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য—আশীর্বাদরূপে।

১২ মার্চ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো যুগান্তর সাপ্তাহিক, এর সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল শ্রীঅরবিন্দের উপর। এর লক্ষ্য ছিল স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা। সশস্ত্র বিপ্লবের পথই স্বাধীনতা অর্জনের পথ। 'যুগান্তর' ছিল অগ্নিবর্ষী। বাংলাভাষায় এই দৈনিক চরমপন্থীদের লক্ষ্য ও মত প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে হলেও প্রয়োজন হলো সর্বভারতীয় একটি ইংরাজী দৈনিকের যা সারাদেশে ভারতীয়দের মনেও চিন্তাধারায় বিপ্লব ছড়াবে। 'বন্দেমাতরম' এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেরোয় সন্ধ্যার অফিস ১৯৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট (এখন বিধান সরণী) থেকে। এর সম্পাদক মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল, সহ সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ। 'বন্দেমাতরম' এর পত্রিকায় আদর্শবাণী ছাপা থাকত 'ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ানস্— ভারত কেবল ভারতবাসীদের জন্য'। পরিচালনা করতেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, আর্থিক সাহায্য করতেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক।

১৪ আগস্ট ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ আরম্ভ হলো। শ্রীঅরবিন্দ তার অধ্যাপক। সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দিয়ে শর্ত দেন শ্রীঅরবিন্দ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন, প্রতিমাসে তিনি একশ টাকা পাবেন। পাস্থির মাঠে হলো বিরাট জনসভা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর। বক্তা শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আবুল হোসেন, কে. এন চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রেমতোষ বসু, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পাল। মনোরঞ্জন সুবোধচন্দ্রকে এই সভায় জনগণের রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। উল্লসিত জনতা তাঁকে রাজা বলে বন্দনা জানায়।

শ্রীঅরবিন্দ এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে একদিকে শিক্ষকের ভূমিকায় কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর মৌলিক চিন্তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়ে তাদের প্রেরণা দেন দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার। ছাত্রদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন একজন উপাস্য পুরুষ। 'বন্দেমাতরম' তুলে ধরল নতুন কর্মসূচী, অনুপ্রেরণা— ভারত আবার মহান হবে, হবে ঐক্যবদ্ধ জাতি 'a great, free and united nation.'

বৌবাজার স্ট্রীটে শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগস্টের দিন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুলের যাত্রা আরম্ভ হলো। ঐতিহাসিক এই দিনে ১৯১/১ বৌবাজার স্ট্রীটের বাড়িটি মাসিক ২০০ টাকায় ভাড়া নিয়ে, এটি চলল ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাস পর্যন্ত। পরে ১৬৪ ও ১৬৬ বৌবাজার স্ট্রীট—দুটি বাড়ি মাসিক সাড়ে চারশো টাকা ভাড়ায় পাঁচ বছরের লিজে ন্যাশনাল কলেজ উঠে যায়—১৯১০ খৃঃ মে মাস পর্যন্ত এই ঠিকানাতে বর্তমান থাকে। দি বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুলের চারটি শাখা, যথাক্রমে Literary (সাহিত্যিক), Scientific (বিজ্ঞানবিষয়ক) Technical (যন্ত্রবিদ্যা) ও Commercial (বাণিজ্য)। প্রতিটি শাখায় জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ শিক্ষকেরা হাল ধরেন। তাঁদের নাম ঃ

সংস্কৃত ও ভারতীয় দর্শন ঃ

দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার ও মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী।

আরবী, পারসিয়ান ও উর্দু ঃ

মৌলভী মইনুদ্দীন।

পালি ঃ ধর্মানন্দ কোসাম্বি ও ভিক্ষু পুরানন্দ।

বাংলা ঃ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (নাট্যকার) মহামহোপাধ্যায় অমূল্যবরণ বিদ্যাভূষণ ও সখারাম গণেশ দেউস্কর।

হিন্দী ও মারাঠি ঃ সখারাম দেউস্কর, বাবুরাও পার্দকার

ইংরেজী ঃ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, প্রসন্ন কুমার বসু, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন খ্যাত), বিনয় কুমার সরকার, শ্রীঅরবিন্দ।

ইতিহাস ও ভূগোল ঃ শ্রীঅরবিন্দ, সখারাম দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয় কুমার সরকার।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, প্রসন্নকুমার বসু, ন্যায়শাস্ত্র

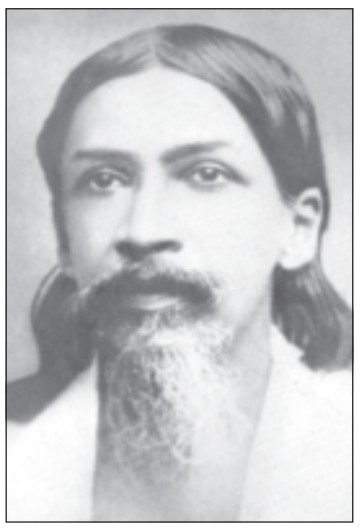

(লজিক) ও পাশ্চাত্য দর্শন—ডঃ পি কে রায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আর্থার, শরৎ রায়।

বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক সখারাম দেউস্কর বিখ্যাত তাঁর 'দেশের কথা' গ্রন্থের জন্য। পরে অবশ্য দেউস্কর ও শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ রাজনীতিও সাংবাদিকতার কাজে বেশী সময় দিতে হওয়ায় ন্যাশনাল কলেজ ছেড়ে দেন। যতদিন শ্রীঅরবিন্দ এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ততদিন অধ্যাপনা করেন নিয়মিত সপ্তাহে দশ ঘণ্টা। সময় বেলা দুটো থেকে চারটে। বিষয়— ভারত ও ইউরোপের ইতিহাস ও ইংরেজী কাব্য।

বিজ্ঞান শাখায় তিনটি বিভাগ— পদার্থবিদ্যা— জগদিন্দু রায় ও হারানচন্দ্র চাকলাদার। নরনারায়ণ বিশ্বাস সহকারী। দুটি ল্যাবরেটরী ও একটি ওয়ার্কসপ এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য। ল্যাবরেটরীর জন্য কয়েক হাজার টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থানীয় দোকান ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকা হতে কেনা হয়। রসায়নবিদ্যা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। যদিও ক্ষীরোদপ্রসাদ নাট্যকার, বাংলা বিভাগে পড়াতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রসায়নের ছাত্র ও শিক্ষক। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে চল্লিশজন ছাত্রের কাজের ব্যবস্থা ছিল। এর দুটি ভাগে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা একসঙ্গে কাজ করতো।

জীববিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বিপিনবিহারী চক্রবর্তী এল এম এস, উপদেষ্টা ডাঃ এস বি মিত্র এবং ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক। অঙ্কের অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ দে, ডাঃ কিশোরীগুপ্ত ও এ পি ঘোষ। প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ বি বি রাণাডে। পরে ভি কে পরাঞ্জপে এবং এস এন দীক্ষিত যোগ দেন টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে। রাণাডে ও পরাঞ্জপে এসেছিলেন মুম্বই-এর ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিকাল ইনস্টিটিউট থেকে। অনুশীলনের জন্য ছিল ওয়ার্কশপ, ছিল একটি কারখানা। এই কারখানাতে কলেজের অন্য বিভাগের জন্য সস্তায় জিনিসপত্র তৈরি করা হোত। উৎপাদনের এই কারখানা অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাইরে থেকে আসতো ভালোমত অর্ডার। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় প্র্যাকটিকাল কাজে হাত পাকানোর ব্যবস্থা বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে প্রথম থেকেই করা হয়।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে বাণিজ্যিক বিভাগে শর্টহ্যান্ড, টাইপরাইটিং, কর্মাশিয়াল অ্যারিথমেটিক, কর্মাশিয়াল জিওগ্রাফি ও বুক কিপিং শেখানো হোত। অধ্যক্ষ কৈলাশ চন্দ্র সরকার। এখানে কলেজের ছাত্ররা ছাড়াও বাইরে থেকে ছাত্ররাও পড়ত।

গবেষণামূলক কাজ আরম্ভ করেন কয়েকজন অধ্যাপক। উদ্দেশ্য উঁচু ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক রচনা। রবীন্দ্রনারায়ণ রায় ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোল, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্র, বিনয় কুমার সরকার শিক্ষা বিজ্ঞানে কাজ আরম্ভ করেন। গবেষণামূলক রচনা ডন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নিয়মিত ভাবে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর এই কলেজ অ্যান্ড স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৭৯। ২৮ জন প্রাইমারি সেকশান, ১২০ জন সেকেন্ডারী সেকসন, আর কলেজে ছাত্র ১৭ জন। টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টে ৫ জন, কমার্স বিভাগে ৯ জন। ছাত্র সংখ্যা কম হলেও শিক্ষকরা ছিলেন ভারী উৎসাহী।

রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ঢাকা, যশোরের মাগুরা, জলপাইগুড়ি, মগরা (প্রাইমারী স্কুল)— জাতীয় কলেজ ও বিদ্যালয়ের শাখা প্রশাখা স্থাপিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ খুলেছিলেন। তাঁর কথায়— জাতির বীজ বপন করবার জন্য, নতুন উদ্যম এনে—মহান ও মহিমাজ্বল ভারতকে সমগ্র বিশ্বের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। কিন্তু তথ্যভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষা নয়, জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের পথ খুলে দেওয়াও নয়, মাতৃভূমির জন্য কাজ ও কষ্ট করে যোগ্য সন্তান গড়ে তোলাই লক্ষ্য। ছাত্ররা যেন তাঁদের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে। ভারতমাতা যেন বিশ্বের সকল দেশের জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেন। বিদেশে গেলেও সেখানে থেকে অর্জিত জ্ঞান নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে— যা ভারতমাতার কাজের জন্য লাগতে পারে। জীবিকা নির্বাহর জন্য ও ভারতমাতার কাজের জন্য নিজের শরীর মন বুদ্ধি গড়ে তোলাই লক্ষ্য। পড়াশোনাও তাঁর সেবার জন্য। ঈশ্বর নির্দিষ্ট এই মহান লক্ষ্য রাষ্ট্রবাদ বা জাতীয়তা সাধন।

শ্রীঅরবিন্দ এই সব কথা বলতে বলতে যেন বাহ্যজগত হতে অন্তরের স্বরাজ্যভূমিতে অভিনিবিষ্ট হতেন। জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরমের সম্পাদনা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বদাই ধ্যানস্থ থাকতেন। অভ্যাগতদের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলে আবার চুপ করে ধ্যানস্থ হতেন।

এমন সময় দক্ষিণী ব্রাহ্মণ যোগী শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রগুরু বিষ্ণু ভাস্কর লেলে বাংলায় আসেন। এর আগে বরোদায় লেলে ও শ্রীঅরবিন্দ দুজনে দিবারাত্র মুখোমুখি ধ্যানে কাটান। কয়েকদিনের অনন্য মন সাধনায় লেলের সমস্ত যোগবল শ্রীঅরবিন্দে সঞ্চারিত হয়, মাত্র তিনদিনে তিনি অচল নীরব ব্রহ্মস্থিতিলাভ করেন। অধ্যাত্মিক শক্তি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পুণায় বক্তৃতাকালে আগে থেকে ঠিক করা বক্তৃতা ছেড়ে শান্ত হয়ে শূন্য মন নিয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন শ্রীঅরবিন্দ—আপনি অনর্গল কথা বেরিয়ে আসতো তাঁর ভাবমুখে। লেলের বক্তব্য ছিল অন্তর দেবতার ইঙ্গিতে ও ভগবৎ আদেশে দেশ সেবা প্রকৃত হবে। ভগবানের আদেশ নিয়ে পথ চললে যাঁর কাজ তিনি শক্তি দেবেন, পথ দেখাবেন।

ভগবৎ আদেশেই পরে পূর্ণযোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করলেন শ্রীঅরবিন্দ। সমগ্র ভারত ও বিশ্বকে অতিমানস চেতনা উপলব্ধি করাতে—পৃথিবীর ইতিহাসে নবযুগ সূচনা করে। তাঁর জন্মদিন ১৫ আগস্টেই তাঁর ভবিষৎবাণী অনুযায়ী ভারত স্বাধীন হয়েছে। চলেছে মানবমুক্তির মহাপথে, বিশ্বকে আলো দেখাতে। মানবত্ব, দেবত্বের মহাসাধনায়।

স্বাধীনোত্তর ভারতে অর্থনীতি

এন সি দে

ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে স্বাধীনোত্তর ভারতের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ বোঝাতে গিয়ে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক এবং খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী ভারততত্ত্ববিদ স্বর্গীয় দত্তপন্ত ঠেংড়ী প্রায়ই নানান গল্প বলতেন। সেইসব গল্পগুলির মধ্যে একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি। এটি থেকেই বোঝা যাবে স্বাধীনতার পর কারা আমাদের অর্থনীতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। গল্পটি এইরকম ঃ একবার এক পণ্ডিতজী তার শিষ্যদের নিয়ে ভারত আবিষ্কারের (Discovery of India) সংকল্প করলেন। সংকল্প অনুযায়ী কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নৌকা করে যাত্রাও শুরু করলেন এক ভোরে। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলেন কত জনপদ, কত জলপথ, কত বনপথ, কত গ্রাম, কত জঙ্গল। দেখলেন দুধারের শস্য-শ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র, নদীর জলে সিক্ত-বসনা গ্রাম্য রমণী। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, রাত্রি গভীর হলো। পণ্ডিতজী ও তার দলবলের চোখেও ঘনিয়ে এল গভীর নিদ্রা। রাত্রি অবসানে দিনের সূর্যালোকে তাদের নিদ্রাভঙ্গ হতেই তারা এখন কোথায় পৌঁছেছে জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে গঙ্গাতীরের স্নানরত মানুষদের কাছে প্রশ্ন করতেই তারা একযোগে জানালেন যে তারা এখনও দশাশ্বমেধ শ্মশান ঘাটেই আছেন। খানা-পিনার বিশাল আয়োজন, মৌরসীপাট্টা ও আলস্যেই তাদের দিন কেটে গেছে। নৌকার যাত্রা আসলে শুরুই হয়নি। ভারত আবিষ্কার (Discovery of India) তাদের অধরাই থেকে গেছে।

এ হলো রূপক গল্প। আনুষঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর। শুধু এটুকু এ গল্প থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষমতাসীন পণ্ডিত নেহরুর দল ও তার পরবর্তী নেহরু-পরিবার কুক্ষিগত কংগ্রেস দল-চালিত ভারতের অর্থনীতি মৌলিক অগ্রগতির সময় পায়নি। বৃটিশের ফেলে যাওয়া আরাম কেদারায় বসে মৌরসীপাট্টা করেই তাদের দিন কেটে গেছে। ভারত তথা হিন্দুস্থানের মানুষের জন্য আছে প্রাচীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক ঐতিহ্য, রয়েছে হিন্দু অর্থশাস্ত্র কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রাচার্যের 'শ্রমসংহিতা'।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে এই যে বিপুল ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও নেহরু এমন এক অর্থনৈতিক বিকাশের পথে দেশকে নিয়ে গেলেন যা সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী। গ্রামপ্রধান কৃষিভিত্তিক দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা ভারী শিল্প। এই কংগ্রেস দলের রয়েছে একজন দার্শনিক পথপ্রদর্শক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি অর্থনীতি সম্পর্কে বলেছেন, ''সেই অর্থনীতি অসত্য যা মানবিক মূল্যবোধকে অবজ্ঞা ও অসম্মান করে।'' গান্ধীজী তাঁর 'হিন্দু স্বরাজ'-এ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য যন্ত্র সভ্যতার বিরোধী। তাঁর ভাষায় ঃ ''একটি কারখানা কয়েকশত জনকে কাজ দেয় এবং হাজারো জনকে কর্মহীন করে দেয়। আমি একটি তেল মিল থেকে কয়েক টন তেল উৎপাদন করতে পারি কিন্তু আমি আবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার মিল শ্রমিকদের কাজ থেকে বিদায়ও করে দিতে পারি। আমি এই কাজকে বলি ধ্বংসাত্মক শক্তি, সেখানে লক্ষ শ্রমিকের হাতে তৈরি উৎপাদন অনেক গঠনাত্মক এবং সকলের পক্ষে শুভদায়ক।'' তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতা বিরোধী কেন তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন— ''পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবাত্মার সঙ্গে তীব্রভাবে শত্রুভাবাপন্ন।'' পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী Middleton Murry তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে তিনি ভুলে গেছেন যে তাঁর সুতো কাটার চরকাটিও যন্ত্র। এর উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে আমি জানি শুধু আমার এই চরকাটি নয়, একটি ছোট্ট দাঁত খোঁচানোর কাঠিটি পর্যন্ত যন্ত্র। তবু আমি যন্ত্রবিরোধী তার কারণ যন্ত্র শ্রম বাঁচানোর এবং শ্রমিক বিদায় করার এক প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে। যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভ হয় না; দেহত্যাগ করলেই জীবাত্মার মুক্তি সম্ভব হয়। আমি তাই এই দেহযন্ত্রও ত্যাগ করতে পারি।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য গান্ধী জীবনালেখ্য নয়। উদ্দেশ্য গান্ধীজীর চরিত্রের দ্বিচারিতা দেখানো। গান্ধীজীর জীবনটাই দ্বিচারিতায় পূর্ণ। তাঁর রাজনৈতিক দ্বিচারিতার উদ্দেশ্যই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের অর্থনীতিতে প্রাধান্য বজায় রাখতে সাহায্য করা। কোনও মানুষের পরিচয় তার কথা নয়, তার কাজই তার পরিচয়। গান্ধীজীর কথা মহাপুরুষ সুলভ, কিন্তু তাঁর কাজ ছিল কাপুরুষ সুলভ। অর্থনীতি সম্পর্কে তার উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি দৃশ্যতঃই ভারতীয় হিন্দুদর্শন লালিত। কংগ্রেস দলের প্রাণপুরুষ যিনি, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর দলের নীতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনায় কংগ্রেস যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করছিল তাতে স্পষ্টতই পাশ্চাত্য-ভাবনার ছাপ ছিল। তাঁর প্রধান শিষ্য জওহরলাল নেহরু দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত করেই তাঁর গুরুর দর্শনকে পরিত্যাগ করেছে। হয় গুরুর মুখঃনিঃসৃত বাণীগুলি ছিল শুধুই মানুষকে মোহাবিষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা। আর নয়তো শিষ্য কেবলই কাজে লাগিয়েছে তাঁর গুরুকে ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গুরুকে শুধু শুধু উড়িয়ে আনেনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ; আর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতিতে অভ্যস্থ ক্রোড়পতি ধনী জমিদার পরিবারের ছেলেকেও শিষ্য হিসাবে লালন করেনি বৃটিশ শাসক কুলের আমলা অক্টাভিয়ান হিউম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দল। এরা সকলেই ছিল দালাল পুঁজিপতি। স্বাধীন শিল্প ও অর্থনীতি গড়ে তোলার মানসিকতা এদের ছিল না। এই মানসিকতা কখনওই দেশের মানুষের মধ্যে জাত্যাভিমান জাগ্রত করেনি। বরং এই মানসিকতাই জাগ্রত করেছে যে পশ্চিমী দেশ থেকে আমদানীকৃত বস্তু, ভাবনা-চিন্তা কিংবা বিভিন্ন উদ্যোগ সবচেয়ে উত্তম।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর বিভক্ত ভারতের এ প্রান্তের ক্ষমতা দখল করেই কংগ্রেস দলের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এদেশের বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার কর্মভিত্তিক স্বাধীন সংগঠিত গ্রামীণ ক্ষুদ্র কুটির শিল্পগুলিকে ক্রমশঃ ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন। লাগাতার বিদেশী প্রযুক্তি আমদানী করতে শুরু করলেন। গড়ে তুলতে লাগলেন বৃহৎ বৃহৎ শিল্প। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) গড়ে তোলা হলো ''মহালনবিস মডেল'' অনুসরণ করে। সম্পূর্ণভাবেই রাশিয়ান মডেলের হুবহু কপি। রাশিয়ান মূলধন, প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদদের সাহচর্যে গড়ে উঠতে লাগল বৃহৎ শিল্প কারখানা। সেগুলি অবশ্যম্ভাবীরূপেই হতে লাগল রাষ্ট্রায়ত্ত। রাষ্ট্র শিল্প গড়া ও পরিচালনায় নিযুক্ত হওয়ায় শিল্প পুঁজি ক্রমশঃ পরিণত হলো আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পুঁজিতে। অর্থনীতিতে এল নতুন নতুন শব্দ ভর্তুকি, ঘাটতি, মুদ্রা মূল্যহ্রাস ইত্যাদি। এই করতে করতে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৯) কালে দেশ সম্পূর্ণভাবে হয়ে পড়ল বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। শিষ্য নেহরু গুরু গান্ধীজীর মত, পথ ও

দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে এই যে বিপুল ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও নেহরু এমন এক অর্থনৈতিক বিকাশের পথে দেশকে নিয়ে গেলেন যা সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী। গ্রামপ্রধান কৃষিভিত্তিক দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা ভারী শিল্প।

দর্শন পরিত্যাগ করলেন। বিদেশী ঋণের পরিমাণ প্রথমে ধরা হয়েছিল ২৪৪৩ কোটি, পরে বেড়ে হয় ৫৮৩৪ কোটি টাকা। এরপর শুরু হয় কেবলই বাণিজ্য ঘাটতি। বাণিজ্যে আমদানী বেশী করলে যে পরিণতি স্বাভাবিক। বাণিজ্যে বিদেশী প্রাধান্য বেশী হলে আর একটি স্বাভাবিক পরিণতি অবশ্যম্ভাবী, তা হলো মুদ্রার বিনিময় মূল্যহ্রাস (Devaluation)। ১৯৫০-৫১ অর্থবর্ষ থেকে ১৯৬৬-৬৭ অর্থবর্ষের আগে পর্যন্ত ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় মূল্য ১৫-১৬ বছর ধরে একই ছিল (৪ টাকা ৭৬ পয়সা ডলার প্রতি)। কিন্তু ১৯৬৬-৬৭ অর্থবর্ষে হঠাৎই আমাদের মুদ্রার মূল্যহ্রাস করে করা হলো ৭ টাকা ৫০ পয়সা অর্থাৎ আমেরিকা এক ডলার দিয়ে আগের চেয়ে ৭ টাকা ৫০ পয়সার দ্রব্য কিনতে শুরু করল। অন্য দিকে ভারত আগের চেয়ে বেশী টাকা খরচ করে সেই এক ডলারেরই দ্রব্য কিনতে লাগল। স্বাধীন বাণিজ্যের বড় বড় আধ্যাত্মিক বুলি আওড়ানো গান্ধীজীর জীবদ্দশাতেই ১৯৪৪ সালে গ্যাটের ব্রেটনউড বৈঠকেই ধনী দেশগুলো এই শর্ত সদ্য স্বাধীন গরীব দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়। IMF ভারতকে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করলে আর সাহায্য (ঋণ) দেবে না বলে ব্ল্যাকমেইল করার ফলে এই ক্রমাগত টাকার মূল্য কমে গেছে। ২০০৪ সালে কংগ্রেস ক্ষমতা পাওয়ার পর এই বিনিময় মূল্য ৫০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের ৫০ টাকা দিয়ে ওদের ১ ডলারের জিনিস কিনতে বাধ্য করেছে। উদাহরণ স্বরূপ ওদের এক হাজার ডলার ঋণ মেটাতে ভারতকে দিতে হচ্ছে প্রায় ৫০,০০০ টাকা।

এইরকম চলতে চলতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে এল। শুধুই আমদানীর ফলে বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডারও তলানিতে ঠেকল। এই সময় এই জাতীয় আর্থিক সংকটকে বাড়িয়ে তুলতে এলেন নেহরুর নাতি রাজীব গান্ধী। তিনি স্লোগান তুললেন (৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়ে) ''দেশকে একবিংশ শতকে নিয়ে যেতে হবে''। কিন্তু কিভাবে? তাঁর মতে, প্রথমত, ভারতীয় প্রযুক্তি ফেলে দিয়ে বিদেশী প্রযুক্তি আনতে হবে, দ্বিতীয়ত, দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের কাছে অসংরক্ষিত অবস্থায় প্রতিযোগিতা করতে হবে এবং তৃতীয়ত, আমদানী বৃদ্ধি করতে হবে। রাজীব গান্ধীর এই নীতির ফলে তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকালের শেষে বিদেশী মুদ্রা ভাণ্ডার প্রায় শূন্যে পৌঁছে গেল। কারণ এই জমানায় রপ্তানীর পরিবর্তে কেবল আমদানীর উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল। এই জমানার দায় মেটাতে পরবর্তী সরকারকে দেশের সোনা ইংল্যান্ডের এক ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই সোনা দেশে ফিরিয়ে আনতে দেশকে দিতে হয়েছিল চরম মূল্য। আই. এম. এফ. থেকে ৭.৫ মিলিয়ন ডলার (আমাদের টাকার মূল্যে ৩৫-৪০ হাজার কোটি টাকা) ঋণ নিতে হয়েছিল লজ্জাজনক শর্তে। শর্ত অনুযায়ী গ্রহণ করতে হয়েছে নতুন আর্থিক নীতি, নতুন শিল্প নীতি ১৯৯১ সালে। প্রবেশ করতে হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO)। বিনা বিচারে মেনে নিতে হয়েছে বিশ্বায়নের শর্তগুলিকে। উদারীকরণের শর্তে দেশের সযত্নে রক্ষিত বাজারকে খুলে দিতে হয়েছে লুণ্ঠনকারী বণিকদের কাছে। ১৯৯৪ সালে ডাঙ্কেল প্রস্তবে সই করেছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। যে প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী। তারই পরিণতিতে ১৯৯৫ সালে ভারতকে WTO'র সদস্য হতে হয়। ১৯৯৬ সালে বাম ও কংগ্রেস সমর্থিত দেবেগৌড়া সরকার সিঙ্গাপুর সম্মেলনে ভারতের স্বার্থকে বন্ধক রেখে আসে। বামপন্থীদের প্ররোচনায় একের পর এক লোকসানে চলা বেসরকারী কলকারখানাকে এক সময় রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। নয়া আর্থিক নীতি, শিল্পনীতি, ডাঙ্কেল প্রস্তাব গ্রহণ, ডব্লু.টি.ও'-তে প্রবেশ এবং সিঙ্গাপুর সম্মেলনের পর শুরু হয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রির হিড়িক। মার্চ, ১৯৯৮ থেকে মার্চ ১৯৯৯ এই এক বছরে রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা সারা দেশে ২,২১,৫৩৬ থেকে বেড়ে হয়ে যায় ৩,০৬, ২২১। কিন্তু বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০১ সালে এই রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা কিন্তু অনেকটাই কমে হয় ২,৫২,৯৪৭ টা। বেকারের সংখ্যা তার সঙ্গে বেড়েছে তাল মিলিয়ে। ১৯৮০ সাল থেকে মূলত রাজস্ব আয় থেকে রাজস্ব ব্যয় ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আর্থিক ঘাটতি। রপ্তানী বাণিজ্যেও ভারত সব সময় পিছিয়ে। আমদানী বেশী হয়েছে। অর্থাৎ বাণিজ্যে সব সময়ই থেকেছে ঘাটতি। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে (১৯৯৭-২০০২) এই ঘাটতি ছিল ২,২৮,৩৭৭ কোটি টাকা। এন ডি এ সরকারের শেষ লগ্নে আর্থিক ঘাটতি ছিল (২০০০-২০০১) ১,১১,২৭৫ কোটি টাকা, ২০০৯-১০'র বাজেটে (RE) ৪,১৪,০৪১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

বিজেপি-জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই অনেকগুলি মৌলিক সংস্কারের দিকে নজর দেয়। তার মধ্যে প্রধান হলো এই আর্থিক সংস্কার, দেশকে ঋণ মুক্ত করা। দেশকে ঋণ মুক্ত করার প্রধান উপায় হিসেবে শুরু করে আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা। আর্থিক ঘাটতি ক্রমশ কমিয়ে এনে শূন্যে নামিয়ে আনা। ঘাটতি কম থাকলেই বিদেশী ঋণের আর প্রয়োজন হবে না। রপ্তানী বাণিজ্যরত ছোট ছোট শিল্পের জন্য কম সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের উপর সুদ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে রপ্তানী বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বেড়েছিল। আর তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিদেশী ঋণ শোধ করে দিয়েছিল, আর এটাকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য Fiscal Responsibelity & Budget Management Act পাশ করানোও হয়েছে ২০০৩ সালে। কিন্তু আইনটি পুরোপুরি চালু করার অগেই বাজপেয়ী সরকারের পতন ঘটে।

কংগ্রেসী সরকার এই আইনকে মনেপ্রাণে যে মানেনি তার প্রমাণ আবার সেই ঋণ করে বাজেটে রাজনৈতিক দানছত্র করা শুরু হয়েছে। পরিণামে রাজস্ব ঘাটতি, আর্থিক ঘাটতি, বাণিজ্যিক ঘাটতি, IMF/World Bank থেকে ঋণ গ্রহণের মতো কালো দিনগুলি পুনরায় ফিরে এসেছে।

কোরেল রঙিন বিজ্ঞাপন

কোরেল রঙিন বিজ্ঞাপন

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিদেশনীতি

মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে শুধু একটি বিষয় চিরস্থায়ী। বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তিতও হচ্ছে এই একটি মাত্র কারণে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সুরক্ষাজনিত স্ট্র্যাটেজিক লাভের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র কূটনৈতিক চাল দিচ্ছেন। বিগত ষাট বছরের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ইউরোপের বহু রাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ইত্যাদি রাষ্ট্র মিত্রপক্ষে ছিল। জার্মানী, জাপান ছিল শত্রুপক্ষ। যদিও পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, উত্তর কোরিয়া, শাহ-এর আমলে ইরান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুদেশ, খোমানির আমলে বৈরী রাষ্ট্র। ঠান্ডা যুদ্ধের সময় দুটি বিশ্বশক্তির উদয় হওয়ায় কিছু রাষ্ট্র ভারত, যুগোশ্লোভাকিয়া ও মিশরের প্রচেষ্টায় জোট নিরপেক্ষ সংগঠন সৃষ্টি করে উভয় জোট থেকে সমদূরত্ব রক্ষা করে চলার প্রয়াস করেছেন। স্বাধীন ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকতে রাজী হয়নি, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করার পরই পাকিস্তান তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জোটে সামিল হলো এবং সিয়েটো ও সেন্টো সমঝোতায় সাক্ষর করে জোটে সামিল হলো। সেই সখ্যতা আজও অটুট। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর লৌহ পর্দা খসে পড়ল। রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ বন্ধু রাষ্ট্র। পাকিস্তানের প্রয়াসে হেনরি কিসিংগার গোপনে চীন সফর গেলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই রইল পৃথিবীর একমাত্র সর্ব-শক্তিমান রাষ্ট্র। কিন্তু সেই পরিচয়ও এখন প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলি বিপাকে পড়েছে। এশিয়ার উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি সেই বিপর্যয় অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে, রাষ্ট্রীয়নীতি এবং আদর্শ জলাঞ্জলি না দিয়ে বিদেশনীতি পরিচালনা করা সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু ভারতের সংসদে সমস্ত পক্ষই এই বিদেশনীতির বিষয়ে সরকারকে সমর্থন করে এসেছেন। বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে ভারতকে ১৯৬২-র চীনা আক্রমণ, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ এর-পাকিস্তানী আক্রমণ ও কারগিলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মিলিসিয়া দ্বারা ভারত ভূখণ্ড চোরাগোপ্তা হামলা করে অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উচ্চ প্রযুক্তির যুদ্ধ বিমান, অন্য অস্ত্র উপকরণ দিতে অস্বীকার করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরঙ্কুশভাবে ভারতের প্রয়োজন মেটায়। আজও রাশিয়া ভারতকে অস্ত্র বিক্রয় করে সাহায্য করে চলছে। অবশ্য ভারতকে অস্ত্র উপকরণ বিক্রয় করতে বহু রাষ্ট্রই লালায়িত। ভারতের কূটনৈতিক নীতি পরিচালনা মোটামুটি সফল বলা চলে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে ঘটেনি তা নয়। ১৯৬৭-৬৮তে ভারতের বিদেশ সচিব এসেছিলেন 'ইন্ডিয়ান মিলিটারী একাদেমী'তে বিদেশনীতি সম্পর্কে ক্যাডেটদের কিছু বলার জন্য। প্রশ্ন করেছিলাম, 'ইস্রায়েলের সঙ্গে ভারত কোনওরকম কূটনৈতিক সম্পর্ক না রাখার কারণ কি? শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা উচিত, অন্তত সেই রাষ্ট্রের ভারত বিরোধী মনোভাব এবং পদক্ষেপ সম্পর্কেও জানার ব্যবস্থা থাকা উচিত।' উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন ক্যাডেটদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, অফিসারদের সঙ্গে নয়। পরে অবশ্য বলেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্রায়েলের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখা ভারতের স্বার্থের প্রতিকূল। চল্লিশ বছর পর পিছন দিকে তাকিয়ে তিনি কি বলতেন জানি না।

কথায় বলে, বন্ধু গ্রহণ কিংবা পরিহার করা যায় কিন্তু প্রতিবেশী অপরিবর্তনীয়। এর কারণ প্রতিবেশী যেমনই হোক তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করার সার্বিক প্রয়াস করতে হবে। এটাই ভারতের কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করার কঠিনতম পরীক্ষা (চ্যালেঞ্জ) হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ভূখণ্ড কেটে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শত্রুসুলভ নীতি প্রয়োগ করে চলেছে। প্রধান কারণ যদিও বলা হয়— জম্মু-কাশ্মীর ভূখণ্ড বিবাদ। কিন্তু বিগত ষাট বছরে পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষ্য সর্ব বিষয়ে ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সমতা রক্ষা করা। ভারতের বিশালতা, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক শক্তি, শিল্প-বাণিজ্য এবং বিশ্বে প্রতিষ্ঠা অনুসারে রাষ্ট্রসংঘে সুরক্ষা সমিতিতে ভারতকে স্থায়ী সদস্য করার প্রশ্নে পাকিস্তানের ভূমিকা, তাকেও ওই সমিতির স্থায়ী সদস্য করতে হবে, অন্যথায় ভারতকেও করা যাবে না। ভারত সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রয়াসে পরমাণু অস্ত্র প্রস্তুত করেছে, স্বর্গীয় জুলফিকার আলি ভুট্টো ঘোষণা করলেন— এক হাজার বছর ঘাস খেয়ে থাকতে হলেও পাকিস্তান ইসলামিক বোমা প্রস্তুত করবে। হলোও তাই, এ কিউ খানের চৌর্য্য বৃত্তির দৌলতে ও চীনের সৌজন্যে তাবা চালাই পাহাড়ে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করল। শান্তিপূর্ণ পরমাণু শক্তি ব্যবহারের নিমিত্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত পরমাণু চুক্তি সাক্ষর করল। বিশ্বের ৪৫টি পরমাণু উপকরণ সরবরাহকারী রাষ্ট্র এই চুক্তি মেনে নিল। ভারত পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল। পাকিস্তানের এখন প্রয়াস তাকেও ওই রকম চুক্তির সুযোগ দিতে হবে এবং চীন ওই চুক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে সাক্ষর করতে আগ্রহী। পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্রের সুরক্ষা পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের কাছে প্রশ্নচিহ্ন। এ কিউ খানের পরমাণু অস্ত্র তত্ত্ব বিক্রয়ের কালবাজারের তথ্য বিশ্ব জানে, তথাপি ভারতের সঙ্গে কদমে কদম মিলিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের প্রয়াস লক্ষণীয়। কোনও ভাবেই ভারতকে পর্যুদস্ত করতে না পেরে জিয়া উল হক ভারতকে হাজার ক্ষতের মাধ্যমে ধীর রক্তক্ষরণ করিয়ে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও আই এস আইকে দিয়ে জেহাদি তৈয়ারির কারখানা চালিয়ে জম্মু-কাশ্মীরসহ ভারতের সর্বত্র জেহাদি সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াস, ভারতে হিজবুল মুজাহিদিন, সিমি ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সংগঠন সৃষ্টি করে অন্তর্ঘাতের প্রচেষ্টা, পাকিস্তানী সমর্থক কিছু ভারতীয়কে অর্থ, অস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে পাকিস্তানের হয়ে রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করানোর প্রয়াস, জাল নোট ছড়িয়ে ভারতের অর্থ ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দেওয়া, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের অর্থ, অস্ত্র সাহায্য দেওয়া; এমনকী হুজির মতো সংগঠনকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার প্রয়াস সেই হাজার ক্ষত সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যেই পড়ে। এমনকী সার্ক সম্মেলনের সদস্যদের মধ্যেও ভারত বৈরী মনোভাব সৃষ্টির প্রয়াস তারা করে চলেছে। আফগানিস্তান থেকে ভারতের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব নির্মূল করার প্রয়াসও সর্বজনবিদিত। ডেভিড কোলম্যান হেডলিকে ব্যবহার করে মুম্বাইতে ২৬।১১-র ঘটনা, পুণায় লিওপোল্ড ক্যাফেতে হামলা পাক বৈরীতার সর্বশেষ নিদর্শন। সমস্ত বিশ্ব ভারতকে অনুরোধ করছে, ভারত তথা বিশ্বের সুরক্ষার স্বার্থে পরমাণু অস্ত্রধর পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস কর। ভারত সেই প্রয়াস নতুনভাবে আরম্ভ করেছে। তাসখণ্ডে আয়ুব খাঁ—লালবাহাদুর শাস্ত্রীজীর আলোচনা, সিমলায় ইন্দিরা-ভুট্টো সমঝোতা, লাহোর-এ মিঁয়া

কথায় বলে, বন্ধু গ্রহণ কিংবা পরিহার করা যায় কিন্তু প্রতিবেশী অপরিবর্তনীয়। এর কারণ প্রতিবেশী যেমনই হোক তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করার সার্বিক প্রয়াস করতে হবে। এটাই ভারতের কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করার কঠিনতম পরীক্ষা (চ্যালেঞ্জ) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নওয়াজ শরীফ ও অটলবিহারী বাজপেয়ীর আলোচনা চলাকালীন মুশারফের কার্গিল অভিযান, মনমোহন-গিলানী আলোচনা হাভানায়, পরে শার্ম-আল-শেখ আলোচনা। সম্প্রতি মালিক-চিদাম্বরম আলোচনা এবং সর্বশেষ উভয় রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আলোচনার কিভাবে যবনিকা পতন হলো, সকলেরই তা জানা। ভারত নিশ্চয়ই আবার আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেবে। কিন্তু বার বার প্রশ্ন একটাই উঠে আসছে, পাকিস্তানের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার কি পাকিস্তানের শেষ কথা বলার অথবা পর্দার অন্তরালে পাক সামরিক কর্তা ও আই এস আই মহানায়ক প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। দীর্ঘ ২০ বছর পাকিস্তানের মুখ চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চুপ করেছিল। এখন ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদী আক্রমণ ও তার নেপথ্যে আই এস আই এবং সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ পরিচালনা শুধু ভারতই নয়, বিশ্বের পক্ষে শঙ্কার কারণ হিসাবেই তাঁদের প্রকাশ্য বক্তব্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'উইকিলিকস' বিগত ছয় বছরের পাকিস্তানী চক্রান্তের গোয়েন্দা তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ করে বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের প্রতিবেশী, শান্তির প্রয়াস ভারতকে চালিয়ে যেতেই হবে। হ্যাম হোঙ্গে কামিয়াব একদিন।

ভারতের বিদেশনীতির আরও বড় পরীক্ষা, আর এক প্রতিবেশীকে নিয়ে। চীন এক বিশাল ভূখণ্ড বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যা, সামরিক শক্তিতে বিশ্বে দ্বিতীয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বে অগ্রগণ্য, পরমাণু অস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশে সফল বিচরণ, বিশ্বের এক মহান অর্থনৈতিক শক্তি। ভারত এবং চীন বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতা ও সাংস্কৃতির ধারক। তিব্বত অধিগ্রহণের সুবাদে তার দাবী অরুণাচল ভূখণ্ড এবং লাদাখের কিছু অংশ। আকসাই চীনেরও ভারত ভূখণ্ড চীন অধিকার করে রয়েছে।

চৌ এন লাই ভারতে এসে ''হিন্দী-চীনি ভাই ভাই'' এর আওয়াজ তুলে ভারতবাসীকে জিতে নিলেন, 'পঞ্চশীল' আগেই স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যখন বোঝা গেল তিব্বত অধিগ্রহণ নিয়ে ভারত প্রতিবাদী নয়, বন্ধুত্বের খাতিরে তিব্বতিদের হানদের মুখে ফেলে দিতে কোনও দ্বিধা করবে না, তারা ১৯৬২-তে ভারত আক্রমণ করল দাবী করা ভূখণ্ড দখল করতে। ভারত প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু বিমানবাহিনী ব্যবহার করে তাদের প্রভূত ক্ষতি করতে পারত, কিন্তু ভারতীয় বিমানবাহিনী যতই সাধারণ হোক ব্যবহার করেনি। তারা ফিরে গিয়েছিল, আকাশ পথ ছাড়া তখন অতবড় বাহিনীকে সক্রিয় ও সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হোত না। সেই সময় থেকে চীন বিশ্বের প্রতিটি মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে পথ চলেছে। সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা মঞ্চে ভারত চীন একই পক্ষে ছিল। কিন্তু ভূমিগতভাবে অরুণাচলের দাবী এবং পরিপ্রেক্ষিতে সৈনিক নজরদারী— সে চালিয়ে যাচ্ছে। আমার অভিজ্ঞতা চীন কূটনৈতিক ভাবে কোনও বিষয়েই অসহিষ্ণু হয়ে তাড়াহুড়ো করে না, তার স্ট্র্যাটেজি দীর্ঘমেয়াদি, ভারত-তিব্বত সীমান্তে সে সড়ক নির্মাণ করেছে, চুম্বিভ্যালি পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করছে। তিব্বতের মালভূমিতে উপযুক্ত উচ্চ প্রযুক্তির বিমান অবতরণ ক্ষেত্র, জ্বালানী সরবরাহের পাইপ লাইন ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। দলাই লামাকে খাটো করতে না পেরে পাঞ্চেন লামাকে উচ্চপদ দিয়েছে এবং তিব্বতকে শক্ত হাতে শাসন করছে। ভারত-চীন সীমান্ত আলোচনা তারা ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী নয়, বরং প্রতিটি আলোচনায় নতুন প্রশ্ন তুলে, পরিস্থিতি জটিল করছে। ভারত-বৈরী পাকিস্তানকে ভারতের বিরোধিতার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে উত্তর থেকে তিব্বত এবং নেপালের ভিতর দিয়ে ভারতে কারাকোরাম পার হয়ে পাকিস্তানে (অধিকৃত্য কাশ্মীর দিয়ে) অর্থাৎ ভারতের পশ্চিমে এবং মায়ানমার দিয়ে ভারতের পূর্ব দিকে পৌঁছে গিয়েছে। বিশাল বিদেশী মুদ্রার তহবিল ব্যবহার করে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে সফল হয়েছে। ওই সব ছোট ছোট রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে যথেষ্ট ভাল থাকা সত্ত্বেও যখন অবস্থা সঙ্গীন হবে তখন তারা চীনকে কি ধরণের সাহায্য দেবে বলা সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নিশ্চিত করাই কূটনীতির বর্তমান উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় ভারতীয় বিদেশনীতি এবং তার পরিচালনা বর্তমান সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আফগানিস্তান থেকে ভারতের প্রভাব নির্মুল করার প্রয়াস রোধ করা কি সম্ভব হবে? বঙ্গোপসাগরে চীনা নৌবহর এবং ডুবো জাহাজের আনাগোনা সীমিত রাখা কি সম্ভব হবে? বাংলাদেশে চীনা পরমাণু রিঅ্যাক্টার (Reactor) নির্মাণ করা হবে। শ্রীলঙ্কায়ও তারা তাদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। মায়ানমারে তারা একচ্ছত্র। এই পরিস্থিতিতে ভারত-চীন সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কূটনৈতিক প্রয়াস যেমন জোরদার করতে হবে, সীমান্ত সমস্যা সমাধানের প্রয়াসও করতেই হবে এবং সর্বোপরি সীমান্ত সুরক্ষা সন্তোষজনক করার প্রয়োজন রয়েছে। চীনের সঙ্গে সুষম সম্পর্ক বহাল করতে অর্থনৈতিক, সামরিক এবং প্রযুক্তিগত ভাবে শক্তিশালী ভারত দীর্ঘমেয়াদি, ফলপ্রসূ বিদেশনীতির সার্থক রূপায়ণ করতে সক্ষম হবে।

অন্য সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক রয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের নিমিত্ত ওই সমস্ত রাষ্ট্রকে ভারত সাহায্য দিতে সক্ষম হলে অন্য কোনও রাষ্ট্র সেখানে মাথাগলাবার সুযোগ পাবে না। বিশ্বের অন্যসমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক খুবই ভাল। নিত্য পরিবর্তনশীল জগতে রাষ্ট্রের স্বার্থ যতদিন বিঘ্নিত না হবে, সম্পর্ক ভালই থাকবে। বিদেশনীতি নির্দ্ধারণে ভারতকে এই সত্য ভুললে চলবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ ও বিপথ

নির্মল কর

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উদার ধর্ম-ভাবনার মূল কথাই হলো যত মত তত পথ। এ থেকে ধারণা হতে পারে যে, রামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন ধর্মমতের প্রদর্শিত পথের বিরোধী ছিলেন না, বরং প্রধান ধর্মমতগুলিকে নিজ জীবনে অনুসরণ করে এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন যে, সব ধর্মের লক্ষ্য এক— ঈশ্বরপ্রাপ্তি। তাঁর নিজের ভাষায় 'আমার সব

ধর্ম একপ্রকার করে নিতে হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব বেদান্ত— এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলে আসছে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে (কথামৃত ঃ ৩/২/২)।

তিনি এও বলেছেন, 'কি জান, সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়। সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুঁটি সব ঘর পার না হলে কি চিকে উঠে?'

বিভিন্ন ধর্মের লক্ষ্য জগদীশ্বর, এই তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাবদগীতায় বহু শতাব্দী আগেই উল্লিখিত হয়েছে ঃ যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্/মম বর্ত্মানুবত্তন্তে মুনষ্যাঃ পার্থ সবর্বশঃ (৪/১১)। অর্থাৎ যারা আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাদের সেভাবেই অনুগ্রহ করি। সব মানুষ আমার পথের অনুগামী হয়ে থাকে। উপাসনার পদ্ধতিভেদ সত্ত্বেও মানুষমাত্রই ঐশ্বরিক পথের পথিক। এই উদার মত সত্ত্বেও গীতা স্বধর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলেছে—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।।'

(৩/৩৫)

এই শ্লোকটি পড়লে মনে হয় গীতা স্বধর্মকে অন্যধর্ম থেকে ভাল বলেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও ধর্মকেই হীন বা ভয়াবহ বলেননি, বরং সব ধর্মকেই সমান সম্মান দিয়ে নিজের জীবনে অনুসরণ করেছিলেন।

সর্বধর্মের সমন্বয়ের বাণী ঘোষণা করে রামকৃষ্ণদেব বলেন, 'আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক...তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম।...মত পথ এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ— ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।' ব্রাহ্মধর্মমতের প্রভাবে সাকার নিরাকার নিয়েও তিনি বলেছেন, 'আমি বলি সকলেই তাঁকে ডাকছে। কেউ বলছে সাকার কেউ বলছে নিরাকার। আমি বলি যার সাকারে বিশ্বাস, সে সাকারেই চিন্তা করুক। তবে মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) ভাল নয়, অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক আর সকলের ভুল। দেশকাল পাত্রভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব পথই পথ।

এই সব উপদেশ শুনলে মনে হবে, মানুষকে বোধহয় ধর্মীয় পথ নিয়ে বাদ বিচার

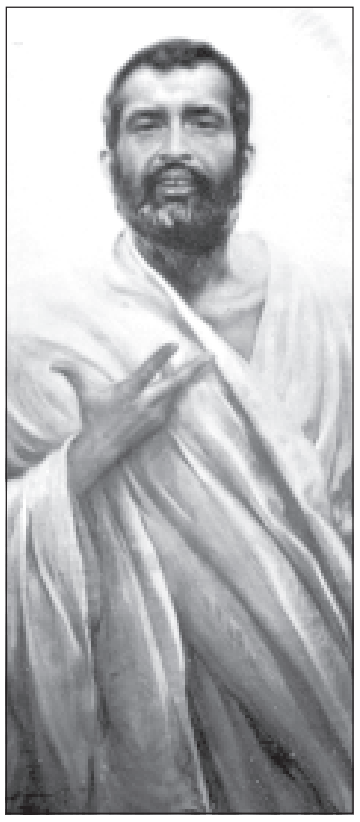

।। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের ১২৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত।।

করতে হবে না। যে-কোনও পথই সে ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্যে বেছে নিতে পারে। এধারণা ঠিক নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ উদার ধর্মীয় তত্ত্ব ঘোষণা করলেও তার ব্যতিক্রম দেখাতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছেন, 'নানা পথ আছে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছিবার। মত পথ। যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। তবে কোনও পথ শুদ্ধ, কোনও পথ নোংরা, শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়া ভাল।' উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ বামাচারের নিন্দা করেছেন। মেনে নিতে পারেননি ভৈরবী সাধনা, ঘোষপাড়া ও পঞ্চ নামী মতকে। যেখানেই কামিনী সংযোগ সেই ধর্মমত তাঁর মতে নোংরা পথ, সুতরাং তা পরিত্যাজ্য। 'ঠিক ঠিক সাধনা করতে পারেনা, ধর্মের নাম করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে'।

ভারতে তান্ত্রিক সাধনার পরম্পরা অতি প্রাচীন। পঞ্চ ম'কারের এই সাধনার মধ্যে মৈথুন একটি বড় অঙ্গ। বীরাচারী সাধকেরা মনে করেন ভৈরবী সাধনা শক্তি সাধনার প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এপথকে বিপথ বলে মনে করতেন। অবশ্য দক্ষিণাচারী তন্ত্র-সাধকেরা পঞ্চ ম'কারকে রূপক বলেই প্রচার করতেন আর নারী-সম্ভোগ বর্জন করতেন। এসব সত্ত্বেও নারীর সঙ্গে সম্ভোগের দ্বারা সাধনা শাক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ প্রভৃতি অনেক ধর্মমতকে কলুষিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন 'নোংরা পথ'। মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান লাভ হয়।

অবশ্য নারীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘৃণা ছিল না, কিন্তু রমণীর মোহিনী শক্তি সম্পর্কে তিনি ভক্তদের সাবধান করে বলেছেন, 'কিছু অবস্থায় আলাদা কথা। ভগবানকে দর্শনের পর বেশী ভয় নাই, অনেকটা নির্ভয়।... যে মেয়েমানুষের কাছে এত সাবধান হতে হয়, ভগবান দর্শনের পর বোধহয় সেই মেয়েমানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে। আর তত ভয় নাই। কথাটা এই, বুড়ী ছুঁয়ে যা ইচ্ছা কর।'

এইসব আলোচনা থেকে জানা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণেরও যত মত তত পথ তত্ত্বের মধ্যেও ব্যতিক্রম আছে। সব পথ গ্রহণীয় নয়। আগেই বলা হয়েছে, 'শ্রেয়ান স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ' অর্থাৎ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্মও শ্রেয়। কিন্তু স্বধর্ম যদি নোংরা পথ হয়, যেমন বামাচারী তান্ত্রিক-সাধনা ইত্যাদি, তাকে ত্যাগ করে অন্য ধর্ম বা শুদ্ধ পথ গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য বিগুণ স্বধর্ম বলতে গীতা নিশ্চয় কাম-নির্ভর ধর্মের কথা বলেনি। গীতা কামরূপী শত্রুকে জয় করতে বলেছে ঃ জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। কারণ, জ্ঞানীগণের চিরশত্রু দুষ্পুরণীয় অগ্নিসদৃশ কাম-জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কে কামের অধিষ্ঠান বলা হয়। কাম এদের দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করে দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব 'তুমি সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশক পাপ স্বরূপ এই কামকে বিনাশ কর।' একাজ যে করতে পারে, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ বর্ণিত 'সিদ্ধ পুরুষ'।

অবশ্যই বলা যায়, বিগুণ স্বধর্ম অর্থে গীতা কামনির্ভর ধর্মকে গ্রহণীয় বলেনি। এই ধর্মও গীতার মতে পরিত্যজ্য। গীতা যা বলেছে, শ্রীরামকৃষ্ণও সেটা সহজ ভাষায় উপমা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের যত মত তত পথকে বিপথ থেকে, নোংরা পথ থেকে পৃথক করতেই হয়। এর জন্যে প্রয়োজন, মানুষের নৈতিক চেতনা বা সদসৎ বিচারবুদ্ধি।

অঙ্গনা

স্বাধীনোত্তর ভারতে এই কী নারী স্বাধীনতা ?

মিতা রায়

পার হলো স্বাধীনতা পরবর্তী তেষট্টি বছর। কত সভা, মিছিল সংঘটিত হলো দেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের উন্নতির খতিয়ান নিয়ে। আবার কিছুদিন আগে ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবসও পালিত হলো সোচ্চারে নারীর স্বাধীনতা অর্জন নিয়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও এই স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার আলো শিক্ষার আলো বিভিন্ন রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সামান্যতমও আলোকপাত করতে পারেনি। আজও সেসব স্থানে বিচারের রায় দেবার অধিকার অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্বর পঞ্চায়েতের ওপর। যথারীতি সমাজে আজও ঘৃণ্যতম ঘটনার শিকার নারী। কোনও প্রমাণ থাক বা না থাক, নারীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অকথ্য নির্যাতন ক'রে একদল পুরুষ গর্বের হাসি হাসে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। হ্যাঁ, এই স্বাধীন ভারতেই এমনই এক নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হলো মধ্যপ্রদেশের একটা গ্রামে।

জঘন্য সেই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। মধ্যপ্রদেশের খাউরাই গ্রামের বাসিন্দা বন্দনাদেবী। তার পাশের বাড়িতে চুরি হয়ে যাওয়ায় প্রতিবেশীরা বন্দনাদেবীকে 'চোর' হিসেবে সাব্যস্ত করে। সেটি প্রমাণের জন্য সালিসীসভা বসে। কিন্তু বন্দনা জানায় যে সে নির্দোষ। কিন্তু কে শোনে কার কথা ! তার উপর একজন অসহায় নারী। সুতরাং গ্রামবাসীদের একসুরে পঞ্চায়েত বাধ্য হয়, বিচারের কাঠগড়ায় ওই 'দোষী' সাব্যস্ত নারীকে দাঁড় করাতে। তাদের দাবি, 'নির্দোষ' প্রমাণ করতে তাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। যদি সেই অগ্নিপরীক্ষায় বন্দনার মৃত্যু হয়, তাহলে প্রমাণ হবে সে চোর আর যদি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে 'নির্দোষ' প্রমাণিত হবে এবং পঞ্চায়েত তাকে অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করবে।

পঞ্চায়েতের নির্দেশ মেনে অগ্নি-পরীক্ষার সব ব্যবস্থা হলো। এই কি সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সতীত্বের প্রমাণ ? না, এই অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা কিছুটা আধুনিক, বেশিটাই অমানবিক। সেই ব্যবস্থায় ছিল তপ্ত লোহার রডের ওপর দিয়ে বন্দনাকে খালি পায়ে হাঁটতে হবে। তা দেখতে উপস্থিত থাকবে গ্রামবাসী। সাক্ষী হিসেবে থাকবে তারাই। নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় বন্দনার পরীক্ষা। তপ্ত লোহার ওপর খালি পায়ে হাঁটতে শুরু করে সে। পা ফেলার কিছুক্ষণ পরই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে বন্দনা। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতেও এক মুহূর্তের জন্য সে হাঁটা থামায়নি। পায়ের অবস্থা শোচনীয়ভাবে পুড়ে কালো হয়ে জ্বালা করতে থাকে। গ্রামবাসী দেখে যাচ্ছে সেই বীভৎস দৃশ্য। দেখবে তো বটেই, তারাই যে সাক্ষী দেবে দোষী নির্দোষীর। বন্দনার এই অদম্য মনোবল দেখে শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা রায় দেয়, বন্দনা সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কারণ বন্দনা প্রমাণ করতে পেরেছে যে সে নির্দোষ।

সারা গ্রাম জুড়ে এই অমানবিক ঘটনা ঘটে গেল, প্রশাসনের সামনে। বর্বর পঞ্চায়েতের প্রধানদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ কেউ নেয়নি। একেই কি বলে সভ্যতা ? এই কী আমাদের স্বাধীন ভারতের পরিচায়ক ! এদিকে বিভিন্ন রাজ্যে জেলায় জেলায় গড়ে উঠেছে সমাজসেবী সংগঠন, মানবাধিকার কমিশন কত কি ! নারীর প্রতি অবিচার নিপীড়ন রুখতে নীতিবাদী মহিলা সংগঠন গড়ে তুলছেন উচ্চবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মহিলারা। সেসব কি শুধুই শোভাবর্ধনের জন্য ? অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, অসহায় নারীদের পাশে এসে তাদের সহায় ও নিরাপত্তা দিতে নয়। প্রশাসন তো অনেক দূরের কথা, সমাজসেবার নামে যারা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, প্রাথমিক পর্যায়ে তো তাদেরই প্রতিরোধ করার কথা। বাস্তবে কোথায় কি ! গ্রামে আজও সচেতনতার কোনও বাণী শিক্ষার যথাযথ মূল্যায়ণের কথা পৌঁছতে পারেনি। তাই গ্রামবাসীদের মানসিকতার উন্নতি ঘটেনি। তাই তো আজও গ্রামে ওঝার প্রতাপ বজায় আছে; তাদেরই বিচারে অসহায় বৃদ্ধা নারীদের 'ডাইনি' সাব্যস্ত ক'রে অত্যাচারের মাধ্যমে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।

আজকে স্বাধীনতার এত বছর পরেও একটাই জিজ্ঞাসা বড় হয়ে উঠছে— কোনওদিনই কি এই সমাজব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে না ! শুধু শহুরে চাকচিক্যে তো সভ্যতার আধুনিকতার বড়াই করা যায় না;সমাজের কু-দিকগুলোকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে হবে। এরজন্য অবশ্যই সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে আইনসভায় মহিলা সংরক্ষণ

গোপীনাথ দে

এইচ ডি দেবগৌড়া তখন কেন্দ্র সরকারে যুক্তফ্রন্টের প্রধান মন্ত্রী। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে মহিলা সংরক্ষণ বিল (সংসদে ও রাজ্য আইন সভাগুলির এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সুপারিশ) প্রথমবার লোকসভায় পেশ করা হয়। ওই বিলে ছিল লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকবে বলেই স্থির ছিল। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির মধ্যে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি মহিলাদের জন্যও পৃথক সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। লোকসভায় ওই বিলটি পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় সমতা পার্টি, জনতা দলসহ বিরোধী কিছু দল বিরোধিতায় সরব হয়ে উঠে। ফলে বিলটির কিছু পরিবর্তন করে সকলের গ্রহণযোগ্য করে আনার জন্য সাংসদ শ্রীমতী গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়।

সংসদে এইভাবে মহিলা সংরক্ষণ বিল আশার প্রধান কারণ ছিল লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা পূর্বের থেকে কিছু বৃদ্ধি হলেও তা আশানুরূপ হয়নি, যেমন প্রথম লোকসভায় মোট ৫৪৩ জন সদস্যের মধ্যে মহিলা সদস্য ছিলেন মাত্র ২৪ জন এবং পঞ্চ দশ লোকসভার মোট ৫৪৪ জন সদস্যের মধ্যে মহিলা সদস্যা মোট ৫৯ জন। বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু আশানুরূপ নয়। তাই সংরক্ষণের মাধ্যমে মহিলা সদস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি র প্রচেষ্টা হয়েছিল। যদিও ইতিপূর্বে ১৯৯২ সালে যখন নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ৭৩ এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে পঞ্চ ায়েত ও নগরপালিকা স্তরে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এইভাবে বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে পঞ্চ ায়েত ও নগরপালিকা স্তরে প্রায় দশ লক্ষ মহিলা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি কোনও কোনও সদস্যা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করলেও, সকলেই দক্ষ নন। অনেকের পিছনে স্বামী, ভাই অথবা পার্টির বিশেষ বিশেষ কর্মী আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছেন। তাই সকলেই দক্ষ একথা হলপ করে বলা যাবে না।

মহিলা সংরক্ষণ বিলে ৩৩ শতাংশ অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে;কিন্তু মহিলা প্রতিনিধিত্ব কোনও সমান সমান বা অর্ধেক হবে না সেকথা বলা নেই। এক্ষেত্রেও কি কিছুটা হলেও পক্ষপাতিত্ব রয়ে গেল না? শতাংশের হিসাব বা অংশের ভাগাভাগিতে না গিয়েও কি প্রশ্ন তোলা যায় না যে আমরা আমাদের মহিলা সমাজকে বা সামগ্রিক ভাবে গোটা সমাজকে কি গণতন্ত্র তথা সমাজ সচেতন করে তুলতে পেরেছি? আমরা জানি সারা ভারতের সাক্ষরতার হার মোট ৬৪.৮৪ শতাংশ এবং পৃথকভাবে পুরুষের সাক্ষরতার হার মোট ৭৫.২৬ শতাংশ এবং মহিলার সাক্ষরতার হার মোট ৫৩.৬৭ শতাংশ অর্থাৎ ১০০.০০ শতাংশ হতে অনেক বাকি। (২০০১ সালে ভারতের চতুর্দশ জনগণনার রিপোর্ট) এ লজ্জা ঢাকার স্থান কোথায়? স্বাধীনতার ৬৩ বৎসর পরেও আমরা এই অবস্থায় আছি। তাই সংরক্ষণ করে অধিকার দিতে হচ্ছে। সংরক্ষণ করে অধিকার দিলে সেটা পরিপূর্ণ বিকশিত গণতন্ত্র হয় না;সীমিত গণতন্ত্র বড়জোর বলা যেতে পারে।

গীতা মুখার্জী কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারে সকলেই একমত হলেও কয়েকটি পার্টি যথা সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, ডি এম কে, সমতা পার্টি, জনতা দল প্রভৃতিরা 'কোটার মধ্যে কোটা' দাবি করে। অর্থাৎ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যেই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী বা ও বি সি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে, নচেৎ তারা বিলটি পেশ করতেই দেবে না বলে হুমকি দেয়।

বিলটির মধ্যে কোটার ভিতরে কোটা, অর্থাৎ ৩৩ শতাংশের মধ্যে অনগ্রসর বা ওবিসি মহিলাদের জন্য সাবকোটা না থাকায় এবং পর পর কয়েকটি সরকার যথা দেবগৌড়া এবং আই কে গুজরাল সরকার এবং ১৯৯৮ সালের বাজপেয়ী সরকারের অকাল পতন ঘটে যায়। ফলে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি পাশ করানোর মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এরপরে ১৯৯৯ সালে ৮ মার্চে আন্তর্জাতিক নারীদিবসে দিল্লিতে বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে বিলটি পাস করানোর দাবি জানায়। তখন অটলবিহারী বাজপেয়ী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং বিলটি সংসদে পেশ করার আশ্বাস দেন। তৎকালীন আইন মন্ত্রী রাম জেঠমালানি যেদিন স্থির করেন বিলটি সংসদে পেশ করবেন, সেইদিন বিরোধীরা অর্থাৎ যারা কোটার মধ্যে কোটা চান তাঁরা আইন-মন্ত্রীর হাত থেকে বিলের কপি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। পরে ২০০২ এবং ২০০৩ সালেও বিলটি পুনরায় এন ডি এ সরকার সংসদে পেশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সংসদে প্রচণ্ড হই-হট্টোগোলের জন্য কাজ হয়নি।

২০০৬ সালে শীতকালীন অধিবেশনে লোকসভায় বিলটি আনার চেষ্টা হলেও লালুপ্রসাদ যাদব প্রভৃতিদের বিরোধিতায় সরকার পিছু হঠে যায়। তখন বিলটিকে জিইয়ে রাখার জন্য সরকার লোকসভার বদলে রাজ্যসভায় বিলটি পেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত মতো ২০০৮ সালে ৫ মে রেণুকা চৌধুরী, কানিমোজি, কুমারী শেলজা, সুপ্রিয়া সুলের মতো মহিলা সাংসদদের গণ্ডীরমধ্যে কোনওমতে বিলটি পেশ করবেন তখনকার আইন মন্ত্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ। ইতিমধ্যে ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য ইউপিএ ক্ষমতায় আসে। জয়ন্তী নটরাজন এর নেতৃত্বে একটি যৌথ সাংসদীয় কমিটি বিলটির সব দিক ভাবনাচিন্তা করে সরকারের কাছে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেয়। তারপর এ বছরের ৯ মার্চ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত ২৩৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৮৬ জন সদস্যের সমর্থনে বিলটি পাশ হয়ে যায়। মাত্র একজন বিরুদ্ধে ভোট দেন। এই বিলের সমর্থনে ছিল প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। এছাড়াও ছিল বামদলগুলি, আকালি দল, অ গ প, টি ডি পি প্রভৃতি দল। এইভাবে রাজ্যসভায় পাশ হলেও বিলটি আইনে পরিণত করতে এখনও অনেক কাজ বাকি। এরপর বিলটিকে লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ করতে হবে। তারপর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন চাই। তারপর দেশের অন্তত অর্ধেক সংখ্যক রাজ্য আইন সভায় বিলটি পাশ করাতে হবে। এরপর সংরক্ষিত আসন নির্ধারণের জন্য আরও একটি বিল পাস করাতে হবে। এরপরে নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। আর তখনই লোকসভায় ও রাজ্য বিধান সভাগুলির ৩৩ শতাংশ আসনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ আইন সিদ্ধ হবে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই যে —ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চ লের রাজ্যগুলি নাকি নারী শাসিত সমাজ; তবুও ওইসব রাজ্যগুলি উক্ত বিলের বিরোধিতা করে। স্বাধীনতার ৬৩ বৎসর পরেও আমরা সংরক্ষণ করে দেশের ও গণতন্ত্রের অগ্রগতির কথা ভাবছি বা কাজে নেমে পড়েছি। কিন্তু জনগণকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক নাগরিক রূপে গড়ে তোলার প্রবণতা বা প্রচেষ্টা কোথায়? এবারের লোকসভায় অর্থাৎ ২০০৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে যে লোকসভা গঠিত হয়েছে তার সদস্যদের মধ্যে এক জন সদস্য এমন আছেন যিনি নিরক্ষর। ৮ জন সদস্য এমন আছেন যাঁরা কোনওক্রমে সাক্ষরতাযুক্ত। ৯ জন অষ্টমশ্রেণী, ৭ জন পঞ্চ মশ্রেণী এবং মোট ৫৪৪ জন সদস্যের মধ্যে আবার ১৫০ জন ক্রিমিনাল। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত আদর্শ গণতন্ত্রপ্রেমী নাগরিক গঠনে আমাদেরদেশ গত ৬৩ বৎসর ধরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই দেখা যাচ্ছে বিগত চোদ্দো বছর যাবৎ উক্ত বিলটি যখন নানান ঘাত-প্রতিঘাত-এর মধ্যে দিয়ে চলেছে এবং এখনও পরিপূর্ণ সফলতা আসেনি, তখন বিকল্প পথের কথা রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ ভেবে দেখতে পারতেন। সেটা হলো মহিলাদের জন্য তেত্রিশ শতাংশ আসন সংরক্ষণ না করে; রাজনৈতিক দলগুলি যে কোনও নির্বাচনে যতগুলি আসনে লড়বে তার এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলাদের প্রার্থী করা হলে সংসদে এবং রাজ্যবিধান সভাগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে বলেই অনেকেই মনে করেন। এবং নির্বাচন কমিশনও তাই মনে করেন। এই ফরমূলা এম এস গিল ফরমূলা নামে খ্যাত। বিশ্বের অনেকগুলি রাষ্ট্রে এই পদ্ধ তি চালু আছে। যথা সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি। এইভাবে দায়িত্বটা যদি রাজনৈতিক দলগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া হোত তবে যারা কোটার মধ্যে কোটা চাইছে তারা অবাধে সেকাজ করতে পারত। যদি কোনও দল মোট ৩০টি আসনে প্রার্থী দিতে চায় তবে ওই দলকে ১০টি আসনে মহিলা প্রার্থী দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সেই দল ১০টি আসনে মহিলা প্রার্থীকেই দলিত সমাজ থেকে দিতে পারবে অথবা উচ্চ বর্ণের মহিলা প্রার্থী দিতে পারে অথবা ১০টি প্রার্থীই সংখ্যালঘু সমাজ থেকে বেছে নিতে পারবে ইত্যাদি। প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে দলই তখন শেষ কথা বলবে।

আসলে সংরক্ষণ করে পরিপূর্ণ বিকশিত গণতন্ত্র হয় না। নাগরিকদের পরিপূর্ণ সমাজ সচেতন ও শিক্ষিত রূপে গড়ে তুলতে না পারার দুর্বলতা ঢাকার সুচিন্তিত কৌশলের নাম সংরক্ষণ।

কলকাতা পুরসভার ৬৫ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী ফল

হিন্দু মা-বাবাদের কর্তব্য

শিবাজী গুপ্ত

লোকসভা, বিধানসভা বা কর্পোরেশন —যে কোনও নির্বাচনেই এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফলাফল বিশেষ চমক সৃষ্টি করে। এবং তা সার্বিকভাবে পরবর্তী নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণে খানিকটা প্রভাবও বিস্তার করে; যদি সেই বিশেষ কেন্দ্রের ফলাফলে লাভবান রাজনৈতিক দলটি এবং সমমতাবলম্বী দলগুলি তথা সমধর্মী ভোটারগণ তার তাৎপর্য অনুধাবন করে পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে বৃহত্তর জাতীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থের কথা মনে রেখে ভোট প্রদান করেন।

যে বিশেষ কেন্দ্রের ফলাফল মাথায় রেখে এই প্রশ্নের অবতারণা, সেটি হলো কলকাতা কর্পোরেশনের ৬৫ নং ওয়ার্ডটি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ওয়ার্ড থেকে প্রেমিকপ্রবর রিজওয়ানুর রহমানের বড়ভাই রুকবানুর রহমানকে তৃণমূলের একচ্ছত্রী নেত্রী মমতাদিদি (মুসলমানদের মমতা আপা) বড় আশা করে টিকেট দিয়েছিলেন। এবং ভেবেছিলেন ভাইয়ের জন্য মমতার আঁশুস্রোতে (অশ্রুস্রোতে) দাদা ড্যাংড্যাঙিয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়ে যাবে। তিনি তো রিজওয়ানুর রহমানের জন্য ঠোঁট কামড়ে ফুলে ফুলে অনেক কেঁদেওছিলেন। রিজওয়ানুরের মায়ের গলা জড়িয়ে অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, এবং তারপর থেকেই রোজ নামাজ ওজুকরণ, হিজব ধারণ ও ইফতার ভোজন করেছেন। মমতা ব্যানার্জির এই শোকোৎসব শুধু লোকদেখানো ছিল না। এর উৎস ও উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান বস্তির ভোটপ্রবাহ যেন অন্য কোনও দিকে না গিয়ে শুধু তার বাক্স ভর্তি করে তোলে।

মমতা ব্যানার্জি আশায় বুক বেঁধেছিলেন এই ভেবে যে, যেভাবে হিন্দুঘরের ডবকা ছুঁড়িগুলি রিজওয়ানুরের জন্য প্রেমের মোমবাতি জ্বেলে রাস্তা আলোকিত করেছে, তাদের সঙ্গে গায়ে গা, পায়ে পা মিলিয়ে নিষ্কর্মা হিন্দু ও মুসলমান ছোঁড়ারা হাত ধরাধরি করে মৌন মিছিল মহামিছিল করে জান কাবার করেছে, যানবাহন বিপর্যস্ত করেছে, তাতে আপ্লুত হয়ে এসব ছোঁড়াছুড়িদের মা বাবারাও কাতারে কাতারে ভোটকেন্দ্রে এসে ঘাসফুল মার্কা বোতাম টিপে রিজওয়ানুরের বিদেহী আত্মার 'মাগকেরাত' (শান্তি) এবং মমতা ব্যানার্জির দেহী আত্মার তৃপ্তি সাধন করবে। বিশেষতঃ হিন্দু ঘরের মেয়েরা যখন মুসলিম যুবকের 'আশনাইতে' (প্রেমে) উন্মত্ত হয়ে বাতি জ্বালিয়ে রাস্তায় নেমেছে তখন আর পায় কে?

তদুপরি, ৬৫ নং ওয়ার্ডে ৫০ হাজার ভোটারের মধ্যে হিন্দু ভোটারের সংখ্যা মাত্র ১৫ হাজার; বাকী সবই মুসলমান ভোটার। সুতরাং রিজওয়ানুরের বড় ভাই রুকবানুরের জয়ের পথ যে অত্যন্ত মসৃণ, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু হিন্দু মা-বাবারা দিদির সব হিসাবনিকাশ বানচাল করে দিল। একটা উচ্চ বংশজাত ঘরের মেয়ে, যে মায়ের বুকের দুধে, বাপের অসীম স্নেহমমতায় বড় হয়েছে। যাকে পরম আদরে লালনপালন করে বড় করেছে, জীবনে কোনও অভাব অনুভব করতে দেয়নি, কোনও চাহিদা পূরণে কার্পণ্য করেনি, সে যখন বিধর্মী বিজাতীয় পুরুষের পাতা ফাঁদে পড়ে, মা-বাবাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে, ঘর ছেড়ে বস্তি বাড়িতে গিয়ে ওঠে এবং বাপের বিপুল সম্পত্তি একটা বিধর্মীর হস্তগত হবার পথ পরিষ্কার করে— তখন সেই মেয়ের বাপ-মায়ের মনের অবস্থাটা অনুভব করার চেষ্টা অন্য কেউ করতে না পারুক, ৬৫ নং ওয়ার্ডের হিন্দু-মা-বাবারা অবশ্যই করেছেন। ভোটের ফলাফলই তার প্রমাণ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা হননি— সুতরাং মায়ের বুক থেকে সন্তান কেড়ে নেওয়ার বেদনা অনুভব করার সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু ৬৫ নং ওয়ার্ডের হাজার হাজার হিন্দু মা-বাবারা শ্রী ও শ্রীমতী টোডির মর্মবেদনা হৃদয় দিয়ে যে অনুভব করেছেন, ৬৫ নং ওয়ার্ডের ভোটের ফলাফলই তার প্রমাণ। ওই মুসলিম অধ্যুষিত কেন্দ্রে আর. এস. পি. দলের হিন্দু প্রার্থী সুশীল কুমার শর্মা রুকবানুর রহমানকে হেলায় হারিয়ে যে আসনটি নিজ দখলে রাখতে পেরেছেন, তার জন্য সারা বাংলার হিন্দু মা-বাবাদের প্রাণঢালা আশীর্বাদ তাঁর উপর বর্ষিত হবে।

পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের সামনে ঘোর দুর্দিন। তারা সারা ভারতে তো বটেই নিজের রাজ্যেও কোণঠাসা। ১৯৪৬-৪৭ সালে তাদের বাপ-ঠাকুর্দারা যেমন মুসলিম গুণ্ডাদের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছিলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের পর সেরকম দুঃসহ পরিণতির জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে। বিশেষতঃ রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে ভোটের জন্য মুসলমানদের পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে, এবং পৃথিবীতে পয়দা হবার পর থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য রিজারভেশন বা সংরক্ষণের যে হিড়িক চলছে, তাতে প্রতিটি হিন্দু পরিবারে একজন করে মুসলমান জামাই গ্রহণের আইন পাশ করাতেও হিন্দু রাজনীতিকরা উদ্যোগী হবে না বলে বিশ্বাস নেই।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ভোটারদের সতর্ক হতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। কলকাতা কর্পোরেশনের ৬৫ নং ওয়ার্ড যে পথ দেখিয়েছে সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় জাত-ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতির ধবজা উড্ডীন রেখে, নিজেদের পরিবারের মানসম্মান বজায় রেখে যাতে বসবাস করতে পারেন সেভাবেই সর্বক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

বিশেষতঃ কন্যা সন্তানের হিন্দু পিতামাতাকে সদাসতর্ক থাকতে হবে, যাতে বন্ধুত্বের মুখোশ ধরে ঘরে ঢুকে আপনাদের স্নেহের পুত্তলিকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। টোডিদের পরিবারের সর্বনাশা পরিণতি দেখে হিন্দু কন্যাদের পিতামাতাকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে। শুধু নিজ পরিবার নয়, হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার পথও দেখিয়েছে কর্পোরেশনের ৬৫ নং ওয়ার্ডের হিন্দু ভোটারগণ। হিন্দুদের তাঁরা বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

স্বাধীনোত্তর ভারতে জনগণের নিরাপত্তা

(৩ পাতার পর)

বাহিনী ১৮ই জুন ২০০৯ সাল থেকে লালগড়ে অভিযানে নেমেছে, তথাপি এদের সাফল্য মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। প্রায় প্রতিদিন বেছে বেছে রাজনৈতিক কর্মীদের খুন করা হচ্ছে। পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে জঙ্গলমহল থেকে প্রচুর গোরিলা যোদ্ধা ক্যাডারে ভর্তি করা হয়েছে। সন্ত্রাস ছাড়াও রাজ্যে জঘন্য অপরাধ প্রায় লাগামছাড়া। রাজ্যে ২০০৯ সালে ২২৮৪টি হত্যা, ২৫১৬টি ধর্ষণ, ৩০১৬টি শ্লীলতাহানি এবং বিবাহে পণ ও যৌতুক সংক্রান্ত ১৭৫৭১টি ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যে নারী পাচার ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে প্রথম স্থানে।

হত্যা, ধ্বংসলীলা, সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সব নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। বিহার রাজ্যে গত ছয় মাসে মাওবাদীরা ৪০টি স্কুল গৃহ ধ্বংস করেছে। রাজধানী দিল্লী জঘন্য অপরাধের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। সেখানে প্রতি ৩০ মিনিটে একটি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। রেলে যাতায়াত কতটা নিরাপদ সেটা ভুক্তভোগীরা অনুভব করেন। মাওবাদী ও দুঃস্কৃতিদের টার্গেট রেলের সম্পত্তি ও ভ্রমণকারী যাত্রীরা। প্রকৃতপক্ষে, সন্ত্রাস ছাড়াও সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আজ বিশবাঁও জলে। দুর্ভাগ্যবশত, সমস্যা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মোটেই দৃঢ় ও একাগ্র নয়। বড় বড় পরিকল্পনা, ঘন ঘন বৈঠক এবং গুরুগম্ভীর প্রচার করেই তারা সন্তুষ্ট। পরিকল্পনার সুষ্ঠ রূপায়ণে এদের গড়িমসি লক্ষ্য করার মতো। দ্বিতীয়ত, সরকারি পদক্ষেপ রাজনৈতিক লাভ ও ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রেখেই করা হয়। কাজেই দলের ও ব্যক্তির স্বার্থ মুখ্য হয়ে উঠে, জনস্বার্থ তলিয়ে যায়। তৃতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন, দোষারোপ ইত্যাদি আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। সন্ত্রাস দমন ও মাওবাদীদের শায়েস্তা করতে পেশীশক্তি বা নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকার পরিবর্তে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হবে প্রধান লক্ষ্য। গ্রামাঞ্চলে ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় উন্নতি হয়েছে নাম মাত্র। বরাদ্দ অর্থের মাত্র সিকিভাগ উন্নতির খাতে ব্যয় হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসনে পুলিশ ও প্রশাসনকে দলের সমর্থকের বা তাঁবেদারের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। তারা জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে শাসক দলের এবং নেতাদের নির্দেশ মতো কর্তব্য পালন করে। অপরাধ দমনে তারা মোটেই নিষ্ঠ, কর্মঠ ও নিরপেক্ষ নয়। তারা জনগণের আস্থা হারিয়ে আজ কর্তব্যচ্যুত ও দিশেহারা। যাইহোক, আইন, শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। সন্ত্রাস দমনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলির যৌথ প্রচেষ্টার সঙ্গে জনগণের কল্যাণে সামগ্রিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সরকার ছাড়াও, প্রতি স্তরে দেশের ও জনগণের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে জনগণের মধ্যে স্বতঃফূর্ত চেতনা জাগানো প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে এ শিক্ষার প্রসার সম্ভব। সে অর্থে ইস্রায়েলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স বাধ্যতামূলক হলে জনগণ দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন হবে এবং প্রয়োজন মতো দেশী ও বহিঃশত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবে। শত্রুর বিরুদ্ধে 'resistence'-এর ক্ষমতা সঞ্চয় এদের ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে দেওয়ার পথ সুগম করবে। রাষ্ট্র ও জনগণ শক্তিশালী হলে সর্বস্তরের শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হবে।

সবশেষে, রাষ্ট্র ও জনগণের জীবন নিরাপদ ও সুরক্ষিত না হলে দেশের অগ্রগতি কোনও মতেই সম্ভব নয়। ভঙ্গুর নিরাপত্তার সুযোগে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে দেশের ও জাতির ঐক্য, সংহতি ও স্বাধীনতা খর্ব করতে উৎসাহী হবে।

কোরেল রঙিন বিজ্ঞাপন

Swastika
16 August - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

Karnataka - ahead on the path to total literacy

Shri. B. S. Yeddyurappa led Government has successfully completed 2 years. During these 2 years, it steered Karnataka towards all round development by taking up a series of welfare and developmental schemes to bring about a qualitative change in the lives of the people.

It's the time bound programmes have begun to show positive results towards achievements to total literacy.

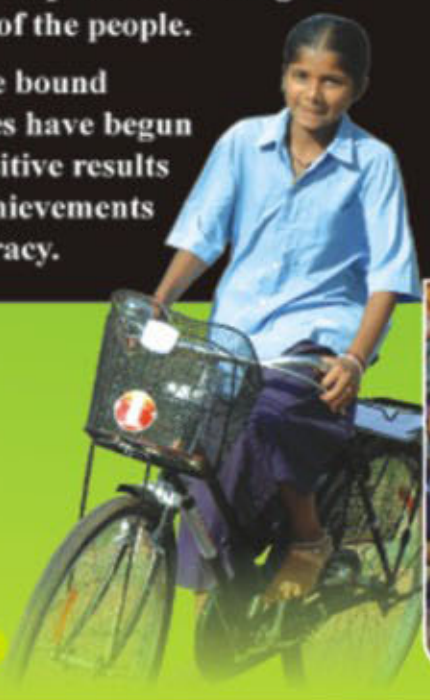

- Bicycles to high school going children in rural areas. About 7 lakh school children have benefitted by the Scheme.
- Subsidy scheme for interest on loans availed by students for Higher Education ; Rs. 2 crore released and about 24,000 poor students were assisted under the scheme.
- 6,700 students were sanctioned Sanchi Honnamma and Sir. C. V. Raman scholarships to the tune of Rs. 1.5 crore.
- 63 lakh students have been distributed free uniforms and 369 lakh free text books on the day of the commencement of Academic year.
- Implementation of 'Nali - Kali' scheme in standards 1 & 2 of all the 45,000 schools in the State.
- Rs. 18 crore released for 114 Kittur Rani Chennamma Residential schools for girls in the most backward taluks.
- Appointed 2,385 Pre-University College lectures, 2,821 High school teachers and 4,928 primary school teachers.
- Recruitment of 13,000 teachers on anvil for improving educational standards.

Sri. B. S. Yeddyurappa
Hon'ble Chief Minister

Development the Keynard of Administration

karnataka information

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com